

ମୁଦ୍ରାକ ସଂଖ୍ୟା

5349.

ପରିଗ୍ରହଣ ସଂଖ୍ୟା

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্তবাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-এল।

শরৎ,

বাল্যকালে, স্কুল-প্রান্ধণে, তোমার যে মধুময় ভাবে আমি আকৃষ্ট ছিলাম, আজিও আমার নিকট তাহা মধুময়। স্মৃতি বাচিয়া থাকুক, আমি তোমার সেই বাল্য মধুর ভাব সম্মুখে রাখিয়া, উত্তপ্ত, কঠোর, বীর্যবান সংসার-মরু, জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, শাস্তি ও স্বখে উত্তীর্ণ হইয়া যাই।

অনেক পুরিয়া, অনেক দেখিয়া, এখন প্রান্তশরীরে অবসর মনে একটা কথা তোমাকে বলিয়া যাই;—কথাটি এই, বাল্যকালের মধুর ভালবাসা ও স্নেহ যেমন মিষ্ট, সমস্ত জীবন-সাগর সঁচিলেও তেমন মিষ্ট জিনিস মিলে না। এখন বহু অনেক পাইয়াছি, কিন্তু সে সকল যেন জীবনশূন্য বস্তু, যেন স্বার্থ-কাঠের ছবি,—ভাবশূন্য, নীরস, কঠোর। এখন কথা অনেক শিখিয়াছি, কিন্তু সে সকল শুক শকাড়ের মাত্র, তাহা যেন প্রাণশূন্য। আর সেই বাল্যকালে, সেই যৌবন-উষায়, আমরা দুইজন, দুইজন্মের পার্শ্বে, স্কুল-ছুটি হইলে যে দাঁড়াইতাম, তখন কথা ছিল না, অথচ ভাবের জমাট তরঙ্গ যেন উভয়ের আঁকলয়সীতে উথলিত হইত,—দুই জন কাষ্ঠ-পুতলিকাবৎ নীরবে যে দাঁড়াইতাম, তাহাকে কত মধুর ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। তুমি বাল্যকালে আমাকে ধর্মের পথ দেখাইয়াছিলে, আর আজ বয়স-প্রান্তরে তুমি বা কোথায়, আমি বা কোথায়! আছে কি? কেবল মধুময় বাল্য-স্মৃতি। তাই বলি, স্মৃতি বাচিয়া থাকুক। স্মৃতি না থাকিলে এতদিন মরিতাম।

বলিতেছিলাম, সেই যে ধর্মের পথে আমরা দুইজন ছুটিতে বাহির হইয়াছিলাম, তারপর অনেক দর্শনের পর, অনেক পরীক্ষার পর, এই আমি কে, বুঝিতেছি কি? আমার সমস্ত লেখা, সমস্ত কথার ভিতরে আমার ধর্ম-জীবন-কাল লিখিত রহিয়াছে। আমাকে যদি বুঝিতে চাও, সমস্ত পড়িবে, অনেক যদি ভাবের ধারণ করিতে চাও, সকল কথা শুনিবে। আমি যে সকল কথা বলিতেছি, এ সকল বলিতে বলিতেই যদি আমার জীবন শেষ হয়, সেই অনন্তধানে, সেই মহিমাময় পুণ্যলোকে নয় আবার উভয়ের মিলন হইবে। তবুও আশঙ্ক কর, আমি বলিয়া যাই।

তুমি না শুনিলে আর শুনিবে কে ? পৃথিবীতে লোক কি আর নাই ? অত-
 বটে, কিন্তু আমার নিকট বাল্যকাল হইতে তুমি যেমন মধুর হইয়া আছ,
 এমন মিষ্ট, এমন মধুর এই পৃথিবীতে বৃদ্ধিবা আর কেহই নাই। মা যের
 সন্তানের নিকট মধুর, সন্তান যেমন মায়ের নিকট মধুর ; স্বামী যেমন স্ত্রীর
 নিকট মধুর, এবং স্ত্রী যেমন স্বামীর নিকট মধুর ; এমন আর কি পৃথিবীতে মিলে ?
 মিলেনা বলিয়াই মাতৃ-প্রেমে ও সন্তান-বাৎসল্যে জগৎ মুগ্ধ। মিলে না বলিয়াই
 দাম্পত্য-প্রেমে জগৎ আত্মহারা। বলিব কি যে, তোমার বাল্য-প্রেম আমার
 নিকট এ সকল অপেক্ষাও মধুর ! প্রেমের নিকট, রূপ, সৌন্দর্য্য তুচ্ছ, জ্ঞান-ব্রিজ্ঞান
 তুচ্ছ, ধন ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ। মানুষ আড়ম্বরশূন্য ভাবে প্রেমে মজিতে চায়, কিন্তু সংসারের
 স্বার্থ তাহাতে বাধা দেয়। ভালবাসায় মজিবার সময় মানুষ কিছু গণনায়
 আনে না, কেবল প্রেমাক্ত হইয়া ডুবিতে চায়। সেইরূপ ডুবাতেই স্মৃথ। আমি
 বাল্যে মাতৃ-হারা ; আমি কেবল তোমার মধুর বাল্য-সখ্য-প্রেমে সজীবিত।
 তুমি, কেবল তুমিই আমার হৃদয় মন যেন পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিয়া আছ। আর
 কেহ শুদ্ধ বা না শুদ্ধ, তুমি শুনিলেই আমি চরিতার্থ হই।

আমার কথা নীরবে শুনিয়া, সেই বাল্যকালের জায় নীরবেই থাকিও।
 শুনিয়া শুনিয়া, তার পর মিলিতে চাও, আবার মিলিও। মিলিতে না চাও,
 দূরে দূরে, অতি দূরেই উভয়ে চলিয়া যাই। বাঁচিয়া থাকুক কেবল বাল্য-
 স্মৃতি, বাল্য-প্রেম, বাল্য-ধর্ম্ম। বাঁচিয়া থাকুক সে সবই, যাহা কপটতা-শূন্য,
 যাহা কল্পনা-শূন্য, যাহা জীবন্ত, যাহা প্রাণস্পর্শী,—যাহা মধুর, যাহা মধুর। তবে
 আজ যাই।

আনন্দ-আশ্রম।

২৪শে কার্তিক, ১৩০২।

}

তোমার অকৃত্রিম স্নেহের

দেবীপ্রসন্ন।

শ্রীমতী প্রমথ কণ্ঠচৌধুরী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ।

উৎকল

নাগরসঙ্কম ও চাঁদবাণী ।

উড়িষ্যা, প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ কাহ্নিকনাথের এক প্রাচীন ভূগ। এক-
দিকে, দউনি পক্ষতে অশোকের প্রস্তাবনাথ ও অশ্বশাসন, উদয়গিরিতে
রামেশ্বর প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন গুহা, বানিত্যিবি ও খণ্ডগিহিন অক্ষয়
বৌদ্ধী, ইন্দ্রেনবাবেক অধিনথব অপূঙ্গ কাককাগাপর্ণ প্রস্তরনিম্মিত
গগনভেদা অসংখ্য মন্দিব, বগাবাবেক অপূঙ্গ অকল স্তম্ভ, ক্ষাঙ্গপুরের
বিবডা-মন্দিব, শুভতথ, সপ্তমাচকা, মুক্তিমণ্ডপ প্রভৃতি এবং সর্কোপরি
উদ্যব সাক্ষভোম দম্বকেন প্রকমোত্তমের অপূঙ্গ দম্বসমযযের বাপাব
সকল দেখিলে উড়িষ্যাকে হিন্দু রাজ্যের চিরোচ্চল দম্ব-ইতিহাসের এক-
খানি উৎকৃষ্ট ছবি বলিয়া মনে তয। অপর দিকে, চিল্কা হ্রদের অপূঙ্গ
শোভা, মহেন্দ্র-পর্কতগ্ৰেণীর অসংখ্য পর্কতমালার বিচিত্র শোভা, এবং
সর্কোপরি পূবীতটে বঙ্গোপসাগবের আশ্চয্য তরঙ্গ লীলা দেখিলে উড়িষ্যাকে
প্রকৃতির এক অক্ষয় শোভাব ভাণ্ডাব বলিয়া মনে তয। উড়িষ্যা, প্রাচীন
কীর্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অক্ষয় ভাণ্ডাব। এ সকল বীহার না
দেখিয়াছেন, ঠাঁহাদিগকে বঝান বড় কঠিন। কিন্তু যাহা দেখিয়া নিজে
মোহিত হইয়াছি, এবং অসংখ্য ব্যক্তি মোহিত হইতেছেন, তাহার কথা
আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ কবিতে সতঃই উচ্চা তয। আমরা জানি,
এ চিত্র নিতান্ত অস্পষ্ট হইবে, কেন না, সে অতুল কীর্তি ও অতুল শোভা
ভাষার লিপিবদ্ধ হইবার নয়। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

অন্য ১৭ই ফাল্গুন (১২৯৫), দোলযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, রাত্রি

ভ্রমণ-স্মৃতি ।

আনুমানিক ১২ ঘটিকার সময় সি-গল (sea-gull) নামক জাহাজে আরোহণ করিলাম। আমরা জাহাজে উঠিয়া দেখিলাম, জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ;—মর্নে হইল, আরো পূর্বে আসিলে ভাল হইত। স্ত্রী পুরুষের একরূপ একত্র সমাবেশ, একরূপ ঘেঁষাঘেঁষি ও মেশামিশি ভাব আমবা পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তীর্থযাত্রীগণের সে উল্লাস, সে জীবন্ত উৎসাহ, সে কোলাহল—অনেক দিন ভুলিতে পারিব না। যে যেখানে স্থান পাইয়াছে, জাহাজের উপর পড়িয়া গিয়াছে, কাহারও পায়ের নীচে কাহারও মস্তক, পরস্পরের দেহে দেহে হুচীভেদ্য যোগ—আত্মাঙ্গ চণ্ডালের শরীরের ঘেঁষাঘেঁষিতে জাহাজে তিলান্দ স্থান নাই। দেখিলে বোধ হয়, জাহাজ থানি যেন পুরুষোত্তমের এক উজ্জল ছবি। ঠিক পুর্বীর তায় এখানে জাতিভেদ নাই,—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক অবস্থাপন্ন। আর পাণ্ডাগণের খোসগল্প, উল্লাস, অঙ্গ-ভঙ্গি, যাত্রীগণের নিকট বীরত্ব প্রকাশ,—জাহাজের এ সকলই শ্রীক্ষেত্রের তায়। এ পথের নেতা পাণ্ডাগণ। জাহাজের কর্তাই যেন পাণ্ডাগণ। আমাদের সহিত কোন পাণ্ডা ছিল না;—সুতরাং ক্ষণকাল আমরা স্থান পাইলাম না। শেষে অতিকষ্টে সন্দের বন্ধু একটু স্থান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, অতি কষ্টে দেহ দুখানিকে রাখিবার জন্ত যে স্থান পাওয়া গেল, তাহার জন্ত ধর্ম্মান্ত কলেবর হইতে হইল, এবং কিছু তীব্র ভৎসনা বা গালিগালাজ পর্যন্ত সহিতে হইল। কেহ কেহ আমাদের সহিত বিষম ঝগড়া করিল। কোলাহলে সে রাত্রি আর নিদ্রা আসিল না। অতি কষ্টে রাত্রি চলিতে লাগিল। শুনিলাম, ৭০০ আরোহী জাহাজে আরোহণ করিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পর একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিলাম। দেখিলাম, কয়েকজন লোক পুলিস যাইয়া জাহাজে লোক অন্বেষণ করিতেছে। তাহারা যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, অবিভেদে স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখের আবরণ তুলিয়া দেখিয়া যাইতেছে। দ্বাদশ মাসের রজনী, হিমের ভয়ে কেহ কেহ মুখাবৃত করিয়া নিদ্রাকর্ষণ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলে, সেই অনুসন্ধানকারী লোকেরা বলিল, একটা কুলবধু এক বৎসরের একটা ছেলে ঘরে রাখিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধানের জন্ত আসিয়াছি। ইহার পর পাণ্ডাদিগকে নানা অশ্লীল ভাষায় গালাগাণি দিতে লাগিল এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা জাহাজের অগ্নি দিকে চলিল। ঘটনাটী আমাদের হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল। কোলের ছেলে রাখিয়া মা আসিয়াছেন!

সাগরসঙ্গম ও চাঁদবাণী ।

ধর্মের জন্ত ?—না আর কিছুর জন্ত ? যদি ধর্মের জন্ত হয়—সে না দেবী ।
আর যদি না হয় ?—ভাবিতে পারা গেল না—বড়ই ক্লেশ হইল । *

ভাবিতে ভাবিতে, কোলাহল শুনিতে শুনিতে, এত লোকের উচ্চ
নিশ্বাস সহিতে সহিতে এবং খালাসী ও যাত্রীগণের গভীরাতের পদধ্বনি
বহিতে বহিতে—সেই কষ্টের রজনী অবসান হইয়া আসিল । জাহাজের
বাণী তীব্র আওয়াজ ছাড়িল, আগুনে ধূম উঠিল ;—খালাসিগণ নৌদ্বর
তুলিল,—অতি প্রত্যাঘে জাহাজ কলিকাতা বন্দর ছাড়িল । ছাড়িবার একটু
পূর্বেই জাহাজে যাত্রী উঠিল । তখন ভাবিলাম, আমরা মূর্খ, সমস্ত রাজি
বৃথা কষ্ট ভোগ করিলাম, শেষ রায়ে জাহাজে উঠিলেই বেশ হইত !

জাহাজ চলিল ; গ্রামের পর গ্রাম, তারপর গ্রাম—সব ছাড়িয়া উদ্দাম
ক্লেগ, ভীম গর্জনে অনন্ত সাগরের উদ্দেশে ছুটিল । রজনীতে যাহারা
আমাদের সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, দিবসে চক্ষুলজ্জাবশতঃ তাহারা আমাদের
সহিত আদ্বৈততা করিল, তাহারা বাঙ্গালী । আমাদের পশ্চাতে একটি হিন্দু-
স্থানী স্থান লইয়াছিল, সে রায়েই আমাদের প্রতি সংবাবহার করিয়াছিল ।
শিয়রে ছইজন উৎকলবাসী লোক, তাহারও আপনার হইল । দেখিতে
দেখিতে বেলা ১১টার সময় জাহাজ হীকবন্দরে (Diamond Harbour)
উপস্থিত হইল । নদী ক্রমেই পরিসর বৃদ্ধি করিতে লাগিল । আমরা অবাক
হইয়া চতুর্দিক দেখিতে লাগিলাম । তীর ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল,
কূল অকূলে মিশিল । বেলা ছই ঘটিকার সময় আমরা কূল ত্যাগিয়া অকূল
বঙ্গোপসাগরের অগাধ নীল বারিরাশিতে ভাসিতে লাগিলাম । যাত্রীগণের
উল্লাস বাড়িল বটে, কিন্তু সে কি জ্ঞাত, জানি না । উপরে অনন্ত আকাশ,
নিম্নে অতল জল,—কেবল শব্দ, কেবল গর্জন, চতুর্দিকে কেবল নীলজল,
কেবল নীলজল ! আমরা আর কখন সাগর দেখি নাই, আমরা সে দৃশ্য
দেখিয়া মোহিত হইলাম । সে দিন সমুদ্র তির ছিল, আমাদের দেখিবার
বিশেষ সুরিধা হইল । কিন্তু একটি দৃশ্য আমাদের ভাগ্যে দেখা ঘটিল না ।
শুনিয়াছিলাম, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ যখন অস্থির হয়,
তখন শত শত ব্যক্তি পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া শয্যার আশ্রয় লয়, মাথা-
ঘুরণিতে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে । কিন্তু আমরা সে দৃশ্য

অমণ-স্বত্বান্ত ।

দেখিলাম না । সাগরের সৌন্দর্য্য প্রচুর দেখিলাম । আর বাজীগণের বিকট চীৎকার, সমস্ত দিনব্যাপী কর্কশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাণ ঝালা পালা হইল । অবিশ্রান্ত তালমানশ্ৰুত উল্লীকৃত গান শুনিয়া শুনিয়া সঙ্গীতের প্রতি ঘণা জন্মিল । আমরা অন্তমনস্ক হইয়া সাগরের অতুল শোভা দেখিতে লাগিলাম । অনেকক্ষণ পর দেখিলাম, সেই অকূল সাগরে একটা প্রকাণ্ড সর্প নির্ভয়ে পাড়ী ধরিয়া যাইতেছে । কোথায় বা তার বসতি, কোথায় বা যাইবে, কতদূর বা যাইবে, অকূল জল কত বা পার হইবে ;—আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইলাম না, প্রাণে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু সে নির্ভয়ে তরঙ্গায়িত নীল জলরাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল । তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে, সাগরের গভীরতা ভাবিতে ভাবিতে, দিন শেষ হইয়া আসিল । সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আরক্তিম হইলেন, ভয়ে যেন কম্পিত-কলেবর হইলেন । আঃ, উপরের সেই অনন্ত নীলাকাশের সহিত নিয়ের সেই অতল নীলজল মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—সূর্য্য আকাশ ছাড়িয়া সাগরে ডুবিতেছেন ! সমস্ত দিন জলিয়া ও জ্বালাইয়া এখন যেন শীতল হইতে যাইতেছেন ! মানুষের অভিসম্পাতের ভয়ে লজ্জায় আরক্তিম মুখ যেন লুকাইতে যাইতেছেন ! আর পূর্ব্বের জ্বালা তেজ নাই । লোক সকল অনিমেঘ নরনে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে, সাগর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-বাহু দ্বারা সূর্য্যকে আলিঙ্গন করিতে যেন ব্যস্ত হইয়াছে । সে আলিঙ্গন, সে যুগল-মিলন, সে মধুর প্রেমাবগাহন দেখিয়া বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম । পাহাড়ের অন্তভেদী শিরে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছি, প্রান্তরের শেষ সীমায় সূর্য্যের রশ্মি ফেলিয়া সূর্য্য পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়াছি, গভীর অরণ্যের ভিতরে সূর্য্যের শেষ জ্যোতি হারাইয়া ফেলিতেও দেখিয়াছি ; কিন্তু সাগর সূর্য্যকে গ্রাস করিতেছে, অথবা সূর্য্য সাগরকে আলিঙ্গন করিতেছেন—এমন মধুর, এমন মনোহর, এমন বিচিত্র দৃশ্য আর দেখি নাই । ধীরে ধীরে সূর্য্য সেই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গময় সাগর জলে অবগাহন করিলেন !! অপরূপ দৃশ্য ! সাগরের মধ্যে একটা সন্ধ্যা দেখিয়া আমরা নবজীবন পাইলাম । শত শত নরনারী অন্তমিত সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল । আমরাও সেই সময়ে বিস্ময়ের অপার মহিমা দেখিয়া বারম্বার তাঁহাকে প্রণাম করিলাম । উড়িয়া যাত্রার প্রথম দিন, আমাদের নিকট স্বর্গের শোভার দ্বার যেন খুলিয়া দিয়া যাইল । আমরা গভীর ভাবে ডুবিলাম, আমরা মজ্জিলাম । এই অল্পপম স্বর্গীয় শোভা যখন শেষ হইল, এবং যখন অন্ধকার আসিয়া সাগরকে

কোড়ে করিয়া বসিল, যখন চতুর্দিকের উর্দ্ধিমালা মহা আঁধারে ডুবিল, তখন আমরা কণকাল চকিত নয়নে জাহাজের পার্শ্বের জলরাশির শোভা দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জাহাজের আঘাতে আঘাতে লবণাক্ত সাগর-জল কেমন এক অপূর্ণ জ্যোতিকণা সকল বিকীর্ণ করিতেছে ;—জল যেন শত শত নক্ষত্রের বেশ ধরিয়া জ্বলিতেছে ;—সেই রাশি রাশি ঈষৎ নীল ফেণার মধ্যে, জোনাকীর স্থায় জগের ঝক্‌ঝকী দেখিয়া প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল ! আমরা আশ্বহারা হইলাম। দেখিতে দেখিতে শেবে আর দেখিতে ইচ্ছা হইল না। আমরা সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম করিলাম। হুতাবসরে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় বৈতরণী নদীতে জাহাজ প্রবেশ করিল,—এবং অল্পকণ পরেই চাঁদবাণীতে জাহাজের লোক সকলকে অবতরণ করিতে হইল। সেই অপরিচিত স্থানে কোথায় বাইব, কোথায় থাকিব, তাবিতে লাগিলাম ; এদিকে জাহাজের থালাসীগণের বিকট চিংকার ও অগীল গান শুনিতে শুনিতে আমরা সেই বাগিময় স্থানে দ্রব্যাদি লইয়া নামিলাম। ঘুটের সাহায্যে একটি ঘর ভাড়া করিলাম। আমাদের দেখে ফিলিস্তানী যাদুীবদ্ধ আমাদের সঙ্গে ছাড়িল না,—এক ঘরেই থাকিল। সে দিন আর অন্নভার হইল না—কষ্টে রজনী যাপন করিলাম।

●প্রাতে চাঁদবাণী দেখিলাম। চাঁদবাণীর নাম অনেক দিন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, বৈতরণী নদী ভিন্ন সেখানে দেখিবার উপযুক্ত আর কিছুই নাই। এখানে জাহাজের লোক সেদিন কটক ঘাইবার জন্য চাঁদবাণীতে অপেক্ষা করিতেছিল। সেখানে অনেকগুলি যাদুী নিবাস। আর চতুর্দিকে কেবল ধূনি। আমরা প্রাতে কোন প্রকারে জাহাজের কাগাঁটা শেষ করিয়া কটকের জাহাজ ধনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু তৎপরে কথা কি বলিব, যে জাহাজ ১০টার সময় ছাড়িবে, কথা ছিল, সেই জাহাজ ৩টার পূর্বে চাঁদবাণী ছাড়িল না। এই ৪.৫ ঘণ্টা টিমার-টিকিট-ঘরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হইল। টিকিট-বাবু এমন সত্যবাদী, এখনই জাহাজ ছাড়িবে বলিয়া টিকিটের টাকা লইলেন, কিন্তু জাহাজ কিছুতেই ৩টার পূর্বে ছাড়িল না। পাছে, আমরা অল্প জাহাজে যাই, একজন্ম বাবু এইরূপ সত্য পথ অবলম্বন করিয়া, আমাদেরকে নিদারুণ সর্বোপর্য্য তাপে, এবং উত্তপ্ত বালুকণায় মগ্ন করিলেন। মনে ভাবিলাম, বাঙ্গালী জাতি কতদিনে সত্যপ্রিয় হইবে !

পুরীর পাণ্ডা। পুরুষ যাত্রীর সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষিত বা সভ্য যাত্রী
 জাহাজে ছই চারিজন ভিন্ন নাই। যাহারা উপরে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা
 কটকের লোক। তত্ত্বিন্ন আরও কয়েকটা ভাল লোক দেখিলাম। তাঁহাদের
 মিষ্ট হাসি, মধুর সঙ্গীত, মিষ্ট কথা এই লোক-মুকভূমির মধ্যে অনেকটা শান্তি
 দিল। আমাদের প্রতি, কি জানি কেন, জাহাজের লোকেরা একটু সদর
 ব্যবহার করিল। আমরা বে কামরায় ছিলাম, সে কামরায় অযোধ্যার কোন
 তালুকদার-পত্নী পর্দার আড়ালে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ১৫২০ জন দাস
 দাসীও সেই কামরায় ছিল। আমাদের অপর পার্শ্বে, ঠিক সম্মুখে, একটা
 আশ্চর্য্য দৃশ্য—চারিটি অল্পবয়স্ক বাঙ্গালীর মেয়ে, সঙ্গে ২১৩ জন পাণ্ডা ও একটি
 মাত্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও ভূষণাদি দেখিয়াই ভদ্রবরের
 মেয়ে বলিয়া মনে করা গেল। আমরা তাঁহাদিগকে এক্রূপ অসহায় অবস্থায়
 দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম এবং সমস্ত্রমে অপর পার্শ্বে আমাদের যৎসামান্ত
 বিছানা বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে অযোধ্যার
 তালুকদার-পত্নীর সঙ্গীয় দুইজন দাসী বাঙ্গালীর মেয়ে কয়েকটিকে বড়ই অপ-
 মান করিল। ঘটনাটি আমার সঙ্গে বন্ধ দেখিয়া মর্মে বড় আঘাত পাই-
 লেন। দেখিলেন, অপমান সহ্য করিয়া মেয়ে কয়েকটি জড়সড় হইল, কিন্তু
 সঙ্গে এমন লোক নাই যে, কেহ ইহার প্রতিবিধান করে। বন্ধ হৃদয়ে আঘাত
 পাইয়া আমাকে ঘটনাটি বলিলেন। পরামর্শ ঠিক করিয়া, আমরা মেয়েদের
 সঙ্গে পাণ্ডাকে ডাকিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম। পাণ্ডাকে যখন ডাকিয়া
 সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, আমি চাহিয়া দেখিলাম, সেই সময়ে বৃদ্ধা
 বড়ই বিরক্ত হইতেছেন। দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল।
 পাণ্ডার উত্তর শুনিও বড় গোলমালে বলিয়া বোধ হইল। মেয়েদের সহিত
 অভিভাবক নাই কেন, কেমন করিয়া ইহারা আসিল, কোথা হই।ও ইহাদিগকে
 পাইলে—এ সকল কথার কোনই সম্ভাবজনক উত্তর দিতে পারিল না।
 নিকটস্থ একজন পাণ্ডাকে দেখাইয়া বলিল, ঐ পাণ্ডা সবিশেষ জানে। সে
 পাণ্ডাকেও ডাকা হইল। 'সে নানারূপ অযৌক্তিক এবং অসত্য কথা বলিতে
 লাগিল। এই গোলমালের সময় সেই বৃদ্ধা পাণ্ডাদিগকে ডাকিয়া তীব্র
 তৎসনা করিল এবং বলিল, "বল যে আমরা গণেশ পাণ্ডার যাত্রী, তোমরা
 গোলমাল কর ত তাহাকে টেলিগ্রাম করিব।" মেয়ে বৃদ্ধি চমৎকার, মনে
 করিল, ইহাতেই আমরা ভব পাইব। বড় ভয়ের কথাই বটে!! তাহাদের

ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমাদের ক্রমে বড়ই সন্দেহ জন্মিল । বৃদ্ধার সহিত অনেক কথাবার্তা হইল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানা রকম মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল । আমরা বুঝিলাম, এই মেয়ে কয়েকটাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া চক্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে । এই সময়ে মেয়েদের মধ্যেও পরস্পর কথাবার্তা চলিতে লাগিল । তাহাতে বুঝা গেল যে, অতিভাবক সঙ্গে বাইবে, এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন মেয়েকে আনিয়াছে ; কিন্তু কোথাকার মেয়ে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, একশ্রেণীর লোক, ভদ্রঘরের মেয়েদিগকে তীর্থের ছলনায় ভুলাইয়া, ঘরের বাহির করিয়া, নানা প্রলোভনে ফেলিয়া চরিত্র নষ্ট করে । যখন তাহারা কুলে উঠিতে পারে না, তখন আত্মীয় পরিজনদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বাজারের দলে প্রবেশ করে । যাহারা এই ঘৃণিত কার্যের ঘটকালি করে, তাহারা মধ্য হইতে বেশ দশ টাকা উপার্জন করে । এই ব্যবসা এ দেশে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এদেশে কল্‌তাবিক্রয় প্রথা দিন দিন বাড়িতেছে, এই কথার সহিত বর্তমান ঘটনাটির বড়ই মিল হইল । কিন্তু আমাদের কিছুই করিবার শক্তি নাই, নীচবে সেই বিষাদময় চিত্রের ধারে বসিয়া ইহাদের কার্যাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম ।

সমস্ত রাত্রি যে সকল ঘটনা হইল, তাহা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না । দেখিলাম, সেই পাণ্ডা ছুটি মেয়েদের গা খেসিয়া বসিতেছে, মুখে পান তুলিয়া দিতেছে, কখনও হাত ধরিতেছে, রসের হাসি হাসিতেছে, কখনও মেয়েদের গা ঠেসিয়া শুইতেছে । একটা মেয়ে জ্রীকনোচিত লজ্জা প্রযুক্ত পাণ্ডার সহিত এক বালিসে শুইতে চায় না বলিয়া বৃদ্ধার দ্বারা পুৰ তিরস্কৃত হইল । এই রূপ নানা ঘটনা দেখিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম । মেয়েদের মধ্যে ছটীকে একটু শাস্তপ্রকৃতি ও পবিত্রস্বভাব বলিয়া বোধ হইল, আর ছটীর চরিত্রে দোষ স্পর্শিয়াছে, অসুস্থমান হইল । তাহাদের পরস্পরের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে হৃদয় উত্তেজিত হইল । কিন্তু কি করিব, আমরা নিরুপায় । ছুই একবার পাণ্ডাদিগকে ভৎসনা করা ভিন্ন আর কোন উপায় পাইলাম না ।

রাত্রি ৯টার পর আমাদের জাহাজ এলবা (Alba) দ্বার দিয়া কেজাপাড়া খালে প্রবেশ করিল । বাঙ্গলার যেমন রেলের কীর্তি ; উড়িষ্যার সেই রূপ খালের কীর্তি । উড়িষ্যার বড় বড় নদী সকল দাঁড়িয়া, সেই সকল নদীর জল খাল দিয়া চালান হইতেছে । খালের দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে,

খালের জলের দ্বারা কৃষিকার্যের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, এবং নিকটবর্তী লোকদিগের জলের কষ্ট নিবারিত হইতেছে । গবর্ণমেন্টের এ এক অপূর্ণ কীর্তি । উড়িষ্যার হিন্দু রাজত্বের স্বতিময়ী যে সকল অক্ষয় কীর্তি আছে, সেই কীর্তির পার্শ্বে ইংরাজ রাজত্বের এ কীর্তি নিতান্ত সামান্ত নয় । পার্শ্বতীয় প্রদেশের নদীর জল এরূপ বাধা না পড়িলে কোন কার্যেরই উপযোগী হইত না—সামান্ত ঝরণার জ্বায় বহিয়া সাগরে পড়িত । কিন্তু ধন্ত ইংরাজ-বুদ্ধি—মক্কাভূমিকে শীতল বারিতে পরিপূর্ণ করিয়া উড়িষ্যায় কি অপূর্ণ মহিমা প্রকাশ করিয়াছে !

কটকের একদিকে কাঠজুরী ও অন্য দিকে মহানদী । কাঠজুরী মহানদীর শাখাবিশেষ । মহানদী হইতে যে স্থানে কাঠজুরী পৃথক হইয়াছে, তাহার নিকট একটা বাধ আছে । মহানদীতে জেত্রার নিকটে আর এক প্রকাণ্ড বাধ দেওয়া হইয়াছে । এই সকল বাধের নাম এনিকট (Anicut) । জেত্রার নিকট নদীর প্রসার প্রায় দুই মাইল হইবে । ইহার উত্তরে মহানদীর অন্য শাখা বিরূপাতে আর একটা বাধ দেওয়া হইয়াছে । মহানদীর প্রবাহিত জলরাশি এইরূপে বাধদ্বয়ে আবদ্ধ হইয়া, ভালদণ্ডা খাল, কেন্দ্রাপাড়া খাল, এবং হাইলেবেল খাল (ভদ্রক পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে) দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে । জলের সমতা রক্ষা করিবার জন্ত এবং নৌকা প্রভৃতি যাতায়াতে জল নিঃশেষ না হয়, এই জন্ত, এই সকল খালে মধ্যে মধ্যে (লক্‌গেট) কপাট-দ্বার করা হইয়াছে । বাগবাজারের খালের কপাটী দ্বারের জ্বায় এই সকল খালে অসংখ্য লক্‌গেট আছে । এই সকল গেট পার হইতে অনেকটা সময় লাগে । এই সকল গেটের নিকটে জাহাজ আসিলে, আরোহীগণ মলমূত্র পরিত্যাগ করিবার জন্ত তীরে অবতরণ করে । রাজ্যে যখন জাহাজ এইরূপ গেটে গেটে লাগিতে লাগিল, তখন ঐ মেয়েরা পাণ্ডাদের সহিত দুই তিন বার কূলে উঠিল । অন্নবয়স্ক বালিকী ভদ্রলোকের মেয়েদের এরূপ স্বেচ্ছা-বিহার, পুরুষের সহিত এরূপ স্বেচ্ছা-মিলন, এরূপ স্বাধীনভাবে কথোপকথন, তীর্থপর্যটনের সময় ভিন্ন আর কুজাপি দেখিতে পাওয়া যায় না । যে সকল নামধারী পাণ্ডারা এ দেশে আগমন করে, তাহাদের অধিকাংশই পাণ্ডাদের বেতনভোগী গোমস্তা মাত্র । কেহ ১১০, কেহ ২০, কেহ ৩০ টাকা কেহ বা তদুর্দ্ধ বেতন পাইয়া থাকে । ইহারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত । ইহারা বাহ্যিক ধর্মের চটক তিলক মালা প্রভৃতি ধারণ ভিন্ন আর কিছু ধর্ম-কার্য করে বলিয়া

জানি না। সন্ধ্যা আহিক করিতে কাহাকেও দেখি নাই। ইহাদের চরিত্রের প্রধান গুণ এই যে, ইহারা সামান্ত ভৃত্যের দ্বারা বাজীদিগের সেবা করে। সেই সেবার খাতিরে বাজীদের সহিত ইহাদের এত ঘনিষ্ঠতা আছে যে, বাজী-মেয়েদের আর অধিক কিছু অনিষ্ট না হইলেও, জী-অনোচিত লজ্জা শরম, বিনয়, গুরুমৰ্যাদা প্রভৃতি ইহাদের কোমল ও মধুর চরিত্রকে একেবারে পরিত্যাগ করে। তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিলে অন্নবরদ্বা মেয়েরা যে চকল হয়, অগ্নিরমতি হয়, লজ্জাহীন হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা একবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ঘরের কেন্দ্রে বাধিয়া রাখা বিষম দার। তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ ত্রীক্ষেত্র। এখানে এক দিকে হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ উদার পবিত্র ভাব রক্ষা পাইতেছে, দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, মন্দিরের অসংখ্য অন্নীল, কুরুচিপূর্ণ জী পুরুষের সঙ্গম-ছবি দেখিলে তেমনি মাতৃবেশ মন স্থপার পরিপূর্ণ হয়। এমন স্থগিত ছবি মাতৃবেশ কল্পনার সৃষ্ট হয়, ভাবিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু শুনিলাম, উড়িষ্যার এই সকল তব নাকি শিকারীর বিষয়, জানি না। এ কথা কতদূর সত্য। যাক্, পাণ্ডাদের লজ্জাশরম-শূন্য ব্যবহারেও যাহারা পবিত্র থাকিতে পারে, তাহারা এই সকল কদর্য ছবি দেখিলে কেমনে বে লজ্জা শরম রাখিয়া বাজীতে কিরিবে, বুঝি না। সে সকল ছবির কথা স্থানান্তরে বর্ণনা করিব। সে সকল ছবির অন্নীল ব্যাখ্যা শুনিলে শলীর ক্রোধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে। সেই সকল ছবির ব্যাখ্যা এইরূপ—“এই দেখ, ভগবান এক সখীর সহিত লীলা করিতেছেন।” লীলা যে কিরূপ অবস্ত, ভাই ভগ্নী, পিতা পুত্র মিলিয়া তাহা দেখিবার যো নাই। যাহারা অন্নবরদ্বা মেয়েদিগকে তীর্থে প্রেরণ করেন, তাহাদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ভারতের তীর্থ স্থানের অব্যবহিত মুক্ত দ্বার সমূহ যুবতী বিধবাদের প্রতি বন্ধ হইলে বুঝি বা ভারতের বৈরিণীর সংখ্যা অনেক হ্রাস হইত। ধর্মের নামে তীর্থ স্থান সমূহে অধর্ম, নানারূপ প্রবঞ্চনা বিক্রীত হইতেছে। দেখিলে অবাক হইয়া বাইতে হয়।

সেই ছুঃখের নিশিতে পাণ্ডাদের নানারূপ কদর্য ব্যবহার দেখিতে হইল—এবং জানাচিন্তে সহ্য করিতে হইল, কেন না, আর উপায় ছিল না। রাজি প্রভাতে আমরা আর একটা লক্‌গেটের তীরে বাইয়া পরামর্শ করিতেছি, এমন সময় সেই বৃদ্ধা ছুটিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য যে, তাহাদের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধা

আসিয়া, অব্যাহিতরূপে, বৃথা অনেক সাক্ষী সাক্ষী মানিতে লাগিল। যে সকল কথা বলিল, তার মধ্যে একটি কথা এই, “মেয়েরা তীর্থ দেখিবার জন্ত পলাইয়া আসিয়াছে, আমি ইহাদিগকে চুরি করিয়া আনি নাই। ইহার মধ্যে একটি মেয়ে এক বৎসরের একটি কোলের ছেলে রাখিয়া আসিয়াছে, ইত্যাদি।” এই কথাটা শুনিয়া আমরা অবাক হইলাম। আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। কলিকাতার ঘাটে লোকেরা যে কুলবধুকে অহুসঙ্কান করিয়াছিল, বুঝিলাম, সে কুলবধু ইহাদের মধ্যে একজন। কি সর্বনাশ! কোলের ছেলে ফেলিয়া মা, প্রলোভনে পড়িয়া, এই নর-পশু সম বৃদ্ধার সহিত আসিয়াছে? কি সর্বনাশ! বৃদ্ধাকে অনেক তিরস্কার করিলাম। জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া বধুকে সম্বোধন করিয়াও অনেক হৃৎখের কথা বলিলাম। তার পর উপরে যে দুটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। বাইরা দেখিলাম, সেখানে আরো দুটি ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ প্রণীত কৃষ্ণদাস পালের একখানি জীবনচরিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদিগকে শিক্তি বলিয়া বুঝিলাম। তাঁহাদের নিকট কলিকাতার জাহাজের সেই অহুসঙ্কান-সংবাদ এবং এই জাহাদের পূর্ব রজনীর সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। অহুসঙ্কানে জানিলাম, নবাগত ব্যক্তি দুইজন স্কুল সব ইনস্পেক্টর, নাম রঘুবাবু ও চন্দ্রবাবু। ইহারা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, ইহারা আমাকে চিনিতে পারিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ইহার উপার করিবেন, আশা দিলেন, এবং নিজে আসিলেন। তাঁহাদের সে সহৃদয়তা, সে সদাশয়তা, বান্দালী মেয়েদিগের সতীত্ব-রক্ষার প্রতি একান্ত অহুরাগ দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম। তাঁহারা নীচের ঘরে আসিয়া পাণ্ডাদের নাম, মেয়েদের নাম, বাড়ীর ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়া লইলেন। জাহাজের মধ্যে আমাদের কামরায় যে সকল লোক ছিল, তাহারা ঐ পাণ্ডাদিগের অবৈধ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কোন কোন সহৃদয় পাণ্ডাও সেই তিরস্কারে যোগ দিয়া বলিতে লাগিল “এই নরাধম দুই পাণ্ডাদিগের অত্যাচারে জগৎজুর নাম লোপ পাইতে বসিল, আর কি কেহ আমাদের বিবাস করিবে?” কিন্তু অল্প কামরায় দুই তিন জন পাণ্ডা আসিয়া ঐ দুই পাণ্ডার সহিত যোগ দিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। জাহাজে

খুব গোলমাল উপস্থিত হইল দেখিয়া তীব্র ভৎসনার তাহার নিরন্ত হইল । বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধা তখন খোসামুদী আরম্ভ করিল । বলিল, “বাবা তোমরা আমার পুত্র । আমাদের সহিত পুরী পর্য্যন্ত চল, তোমরা বা বলিবে, তাই করিব ।” মেয়েদিগকে বলিল “তোমরা ইহাদিগকে প্রণাম কর, ইহারা তোমাদের পিতৃতুল্য ।” এইরূপ নানা খোসামুদীহুচক কথা বলিতে লাগিল । আমরা বৃদ্ধাকে ও মেয়েদিগকে অনেক প্রকার উপদেশ দিলাম । তখনও আমরা ইহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারি না,—কারণ, আমাদের কোনই অধিকার নাই । অতি অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ কটকের ঘাটে পৌছিল । যে স্থানে জাহাজ লাগিল, সে স্থানের অতি অপূর্ণ শোভা । প্রশস্ত-হৃদয় মহানদীর আবদ্ধ জলরাশি কটকের এই স্থানকে অতুল শোভায় ভূষিত করিয়াছে । নদীর অপর পার্শ্বে অসংখ্য পাহাড়-শ্রেণী । এই অপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম । যাত্রীদের কটক প্রবেশ করিবার অধিকার নাই । তাহাদের জন্ত কটকের চারি মাইল দূরে নয়াবাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ওলাউটার আক্রমণ হইতে কটককে রক্ষা করার জন্তই এই বিধান হইয়াছে । যাত্রীরা সেই দিকেই চলিল, আমরা গম্যস্থানে চলিলাম । কিন্তু মন নানা উদ্বেগে পরিপূর্ণ । রঘুবাবু গাড়ী করিয়া আমাদের গিকে নিদিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিলেন । তিনি যেন আমাদের সাহায্য করিবার জন্তই কেত্ৰাপাড়া গিয়াছিলেন । বিদেশে যাহার নিকট যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা চিরকাল মনে থাকে । বাবু রঘুনাথ দাসের সহৃদয়তা ও মধুর ব্যবহার আমরা জীবনে কখনও ভুলিব না । বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন ।

কটকে বাবু মধুহৃদয় রাও একজন সদাশয় এবং মহাশয় ব্যক্তি । তাঁহার বাটীতেই আমরা আশ্রয় লইলাম । তাঁহার বাড়ীতে যাইয়াই সমস্ত পথের কথা তাঁহাকে বলিলাম । তিনি তখনই পুলিশের কোন পরিচিত লোকের নিকট লোক পাঠাইলেন । কিন্তু লোক তখনই কিরিয়া আসিয়া বলিল যে, তিনি যেন কোথায় গিয়াছেন, আরো বলিল যে, কোর্ট ইনস্পেক্টর নারায়ণ বাবুকে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তিনি এই বাবুদিগকে কাছারীতে ঘাইতে বলিয়াছেন । তিনি সবিশেষ অবগত হইলে ইহার প্রতিবিধানের উপায় করিবেন । আমরা তখনই কয়েক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া কাছারী গমন করিলাম । নারায়ণ বাবু উৎসাহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম । “পাণ্ডারা দেশের একমাত্র গৌরব স্বীকৃতির সতীত্ব লোপ করিল, ব্যাটাদের শাস্তি না দিলেই

ময়," এইরূপ নানা উদ্বেজনা পূর্ণ কথা বলিয়া, তিনি আমাদেরগকে লইয়া, আর দুই জন পুলিশ ইনস্পেকটরের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা অসহায় মেয়েদের উদ্ধার করিবার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, নারায়ণ বাবু একেবারে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট গমন করিলেন। সহদয় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখনই বিষয়টা অনুসন্ধান করিতে পুলিশের উপর ভার দিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ ইনস্পেক্টর, নারায়ণ বাবু ও দুই জন কনষ্টেবলের সহিত আমরা নয়াবাজার অভিমুখে গমন করিলাম। সেখানে বাইরা দেখিলাম, সেই মেয়ের দল পুরী বাইবার জন্ত গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে, এবং রক্তনের আয়োজন করিতেছে। পুলিশের নিকট সকল সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহাদের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেল। সেই কুলবধূর স্বামীর নাম জানা গেল, কিন্তু বৃদ্ধা নানা মিথ্যা কথা সৃজন করিয়া বলিল যে, জাহাজে যে মেয়েদিগকে লোকেরা অনুসন্ধান করিয়াছে, আমরা তাহারা নই, আমাদেরগকে বাড়ীর লোকেরা জাহাজে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহার পর পুলিশ তাহাদিগকে অনেক ভৎসনা করিল। কেন এই রূপ অভিভাবক-শূন্য অবস্থার তোমরা আসিয়াছ, বৃদ্ধা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু আমরা বড় গোলে পড়িলাম; ইহারা সেই মেয়েরা কি না, আমরা নিশ্চয় করিয়া কিরূপে বলিব? সুতরাং পুলিশ টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। এ দিকে তাহারা আর এক দিনও অপেক্ষা করিল না, সেই দিনই পুরী বাজা করিল। তখনই নারায়ণ বাবুর সহিত একত্রিত হইয়া মধু বাবুর বাড়ী আসিয়া সেই কুলবধূর স্বামীর নিকট, কলিকাতা, বহুবাজার, হাড়কাটা গলিতে টেলিগ্রাম করিলাম। দুই দিনের মধ্যে টেলিগ্রামের এই রূপ উত্তর পাওয়া গেল যে, "তাহারা পলাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আবদ্ধ করিবেন।" আমরা যখন এই মর্মেণ্ডের টেলিগ্রাম পাইলাম, তখন তাহারা পুরীতে গিয়াছে। টেলিগ্রাম পুলিশকে দেখাইলাম, তাহারা ভিন্ন এলাকার লোক, গ্রেপ্তারের ভার গ্রহণ করিলেন না, আমাদের পরিশ্রম ও চাকের জল ফেলাই সার হইল। হৃৎকম্পিত হইতে কুলবধূদিগকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এ হুঃখ জীবনে ঘুচিবেনা।

কটক ।

পরবর্তী বর্ণনার সাহায্যার্থ আমরা এখানে উড়িষ্যার ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত একটু বিবরণ দিলাম ।

উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী কটক । উড়িষ্যার ইতিহাস নানা আশ্চর্য্য ঘটনা পূর্ণ । দুই সহস্র বৎসর পূর্বে হইতেই উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে পবিত্র ধর্ম-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত । বাক্সালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে যে তিনটি বিভাগ, তন্মধ্যে প্রাচীন কীর্তি, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে উড়িষ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ । পুরীর জগন্নাথমন্দিরে অতি প্রাচীন সময় হইতে যে মাদলাপাঞ্জি সুরক্ষিত হইরাছে, প্রাচীন ইতিহাসের এরূপ উজ্জলতম স্মৃতি-চিহ্ন ভারতবর্ষে আর আছে কি না, জানি না । খ্রীষ্ট অব্দের ২৫০ বৎসর পূর্বে অশোক উড়িষ্যার রাজদণ্ড পরিচালন করেন । ললিতগিরি, খণ্ডগিরি ও ধউলি পর্বতে অশোক শাসনের ও বৌদ্ধধর্মের যে সকল অক্ষরকীর্তি-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা স্থানে তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিব । মাদলাপাঞ্জি অনুসারে অশোকের পর ৩১০ খ্রীঃ পূঃ (B. C.) হইতে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্নবংশীয় ১০৭ জন রাজা উড়িষ্যার রাজত্ব করেন । এই সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কেশরী বংশ, গঙ্গাবংশ, পাঠান, মোগল, ও মহারাষ্ট্র শাসন সংস্থাপিত ও বিলুপ্ত হইরাছে । কেশরী ও গঙ্গাবংশ উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোধণ করিয়া যে সকল কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমতুল্য হিন্দুকীর্তি ভারতবর্ষে অতি বিরল । ভুবনেশ্বর ও যাজপুর (যজ্ঞপুর) কেশরী বংশের প্রধান রাজধানী ছিল । এই উভয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইবে । কেশরীবংশ শৈব ছিলেন । ভুবনেশ্বর শিব-ধাম এবং যাজপুর পার্বতীধাম । ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেশরী বংশ রাজত্ব করেন । এই সময়ের মধ্যে ৪০টা পুরুষ লোপ পায় । ৬৩ জন রাজা রাজত্ব করেন । ইহাদের রাজত্ব কালের অব্যবহিত পূর্বে বৌদ্ধধর্মের একান্ত প্রাচুর্য্য ছিল বলিয়া, ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর মূর্তি ও লি বৌদ্ধমূর্তির দ্বারাতে নির্মিত । এই বংশের রাজত্বের শেষাংশেই কটক সহর রাজধানীতে পরিণত হয় । মকর কেশরী কটকের বিখ্যাত কাঠজুরী বাঁধ নির্মাণ করেন । * এই বংশের রাজা যমাতিকেশরী জগন্নাথ স্থাপন করেন (৪০৯ শকাব্দে) । যে সকল পুরাণে জগ-

ব্রাহ্ম দেবের কথা আছে, সে সমস্তই ইহার পরবর্তী। এই বংশের রাজা ললাটে কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়, ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ক্রমান্বয়ে ৩ পুরুষের ১৫৭ বৎসর-ব্যাপী পরিশ্রমে এই মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। অবিচলিত অধ্যবসায় ও বংশগত ধর্ম্মানুরাগের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই। সপ্তম শতাব্দীতে যাজপুর এই বংশের প্রধান রাজধানী ছিল। এই বংশের আদি সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদগণিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

“জনমেজয় দেব মাদলাপাঞ্জির মতে যযাতি কেশরীবংশের স্থাপয়িতা। বংশাবলী লেখক যযাতির পিতা চন্দ্রকেশরীকে এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা লিখিয়াছেন। যযাতির জন্মদাতার নাম সম্বন্ধে বংশাবলী লেখকের কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিলেও আমরা তাঁহার বাক্য প্রকারান্তরে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় আদি কেশরী এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া বংশাবলীলেখক জনমেজয়কে চন্দ্রকেশরী লিখিয়াছেন।

যযাতির তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতা জনমেজয় ভুজবলে “যবনদিগকে” জয় করিয়া মহানদীতীরস্থিত চৌহ্মার নগরে রাজপাট সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমের সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন। সম্বলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাঠে অহুমিত হয়, রাজা জনমেজয় মগধ রাজদণ্ডের অধীন ছিলেন। দত্ত-কুমার ও হেমমালা বুদ্ধদত্ত লইয়া উড়িষ্যা হইতে পলায়ন করিলে, রক্তবাহ ও তাঁহার সহচরগণ কিছুকাল উড়িষ্যা শাসন করিয়া ছিলেন, তদন্তে মহারাজাধিরাজ মহাভব গুপ্ত রক্তবাহর সহচরবর্গকে উড়িষ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জনমেজয়কে উৎকল সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জনমেজয় মগধাধিপতির জনৈক সেনাপতি ছিলেন (রাজবংশজ হওয়াই সম্ভব) এবং তাঁহার বাহুবলেই উড়িষ্যা রক্তবাহর অহুচরবর্গের কবল-ভ্রষ্ট হইয়াছিল।

জনমেজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চৌহ্মার ও পুরণের তাম্রশাসনের সম্যালোচনার অহুমিত হয় যে, জনমেজয়ের তিরোভাব ও যযাতির আবির্ভাব কাল মধ্যে আরও ছই তিন নরপতি উড়িষ্যা শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলই গুপ্ত নরেন্দ্রদিগের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জনমেজয়, কন্দর্প ও যযাতির তাম্রশাসন পর্যালোচনা করিয়া আমরা তৎকালীন গুপ্ত রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন কবিরাছি।

১। ত্রিশিৰগুপ্ত দেব।

২। ত্রিমহাভব গুপ্ত

৩। ত্রিমহাদেব গুপ্ত।

৪। ত্রিমহাশিব গুপ্ত।

১ ও ২ নং নাম জনমেজয়ের শাসনপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ ও ৩ নং নাম কন্দর্প দেবের শাসন পত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ২ ও ৪ নং নাম যযাতির তান্ত্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৌহরার নগরে প্রাপ্ত তান্ত্রশাসন পাঠে অল্পমিত হয়, মহাদেব গুপ্তের শাসনকালে কন্দর্পদেব উড়িষ্যা শাসন করিতেছিলেন।

কন্দর্প দেবের শাসন পত্র পাঠে বোধ হয়, এই সনন্দ জনমেজয়ের সনন্দ দর্শন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। মহাভব গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ মহাদেব গুপ্ত জনমেজয়ের পুত্রকে রাজ্য প্রদান না করিয়া কন্দর্পকে উড়িষ্যার শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কন্দর্প দেবের পর আরও ২১ জন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ছিল। কিন্তু মহাভব গুপ্তের পুত্র মহাশিব গুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যযাতিতে উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন—একপ অল্পমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

যযাতি কেশরী।—পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে যযাতি জনমেজয়ের পুত্র। তিনি মহারাজাধিরাজ মহাশিব গুপ্তের সমসাময়িক ও দণ্ডাধীন ছিলেন।

মহারাজা যযাতি অনান্যথাৎ “যযাতিপুর”, মতান্তরে “যজপুর” (যাজপুর) নগরী নির্মাণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। প্রবাদ অনুসারে মহারাজ যযাতি আৰ্য্যাবর্ত হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্বক যযাতিপুরের চতুর্পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন।”

মকরকেশরীর সময় হইতে আমরা কটকের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, সুতরাং কটক যে অতি প্রাচীন সহর, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তৎপরে গঙ্গা বংশের সময়েও কটকের নিকটবর্তী স্থান সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের “অনিরুদ্ধ ভীমদেব প্রথমতঃ যাজপুর ও চৌহরার নগরে বাস করিতেন, পরে তিনি কটক নগরীর পশ্চিমোত্তরে প্রাপ্তস্থিত বারবাটী নামক স্থানে রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।”

গঙ্গাবংশ ১১০২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশের রাজা অনিরুদ্ধ ভীমদেব পুরীর বর্তমান মন্দির ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। এই বংশের ৮ম রাজা লাক্ষ্মীনারায়ণ ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কণারকের অরুণভক্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কৈলাস বাবুর ত্রিমাধ্যম হইতে উদ্ধৃত হইল।

“কেশরী বংশের অধঃপতনের পর গঙ্গারাজী অর্থাৎ তামলুকের রাজগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনন্ত বর্ষা সমধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক ইহাকে কোলাহল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অনন্ত বর্ষা বিদ্যাচলে বিদ্যাবাসিনী দেবী স্থাপন করিয়া অক্ষর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেবী মূর্ত্তির সেবা পূজার ব্যয় নির্বাহ অল্প মহানদী তীরস্থিত দান্দি গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই গঙ্গারাজী বংশে উত্তর কালে অহিনামে এক রাজা জয়গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র স্বপ্নেশ্বর ও কস্তা সুরমা দেবী। পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্নেশ্বর উৎকলের রাজত্ব ধারণ করেন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্তু অপরূপ অবস্থায় তিনি কালকবলিত হইলে তাঁহার ভগিনীপতি উৎকলের সিংহাসন অধিকার করেন।

উৎকল দেশের দক্ষিণ প্রান্তে চন্দ্রবংশীয় রাজা উড়গল * রাজত্ব করিতে ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ত্রিরাজরাজ দেব †, কনিষ্ঠ অনিরুদ্ধভীম দেব। ত্রিরাজরাজ দেব স্বপ্নেশ্বরের ভগিনী সুরমা দেবীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। স্বপ্নেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি উৎকল সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। সুতরাং রাজরাজ দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা অনিরুদ্ধ ভীমদেব উৎকল সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন (১০৯৬ শকাব্দ)। উড়িষ্যাদিগের উচ্চারণ ক্ষমতার ন্যূনতাহেতু প্রবল প্রতাপ গঙ্গপতি, রাজাদিগের চূড়ামণি “অনন্ত ভীম” নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু শাসন পত্রে তাঁহার নাম স্পষ্টাক্ষরে “অনিরুদ্ধ ভীম কোমিত রহিয়াছে।”

প্রতাপ কল্প দেব গঙ্গাবংশের শেষ রাজা। ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। চৈতন্য দেব ইহার রাজত্ব কালে ১২ বৎসর উড়ি-

* বিকৃত নাম চৌরগল বা চৌরংগেব।

† ইতিহাসে রাজেশ্বর দেব।

য্যায় ধর্ম প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে অধিষ্ঠিত হন। এই রাজত্বের সময়ে তাম্রকূট নগর (বর্তমান ভবলুক) খুব সমৃদ্ধিশালী সমৃদ্ধ তীরবর্তী নগর রূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

গঙ্গাবংশের পর পাঠান ও মোগল রাজত্বের সময়ে ক্রমে ক্রমে কটক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। কালাপাহাড় কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয় ও হিন্দু দেবদেবীর অনিষ্ট সাধন চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গুলি এই সময় হইতে অর্পেকাকৃত হীনপ্রভ হইতে লাগিল। পাঠান রাজত্বের পর মোগল রাজত্বের সময়ে রাজা তোড়লমল ও মানসিংহের দ্বারা বহিঃ জগন্নাথের সেবার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ভুবনেশ্বর ও বাজপুরের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। মোগল রাজত্বের পর মারহাট্টাগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। এক হিসাবে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং অল্প হিসাবে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মারহাট্টাদিগের শাসন বিলুপ্ত হয়, এবং উড়িষ্যা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। মারহাট্টারা কটককেই প্রধান রাজধানী করেন। মোগল ও মারহাট্টা রাজত্ব কালেই কটকের বিশেষ ঐশ্বর্য সাধিত হয়।

কটক নগর দ্বাংসার বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ই জানেন, কাটজুরী নদীর বাধ, কেলার ভগ্নাবশেষ, জীর্ণ মসজিদ সমূহ, সৈন্ডাগার প্রভৃতি কটকের প্রাচীনত্ব অতি উজ্জল পরিষ্কার ভাষায় কীর্তন করিতেছে। কাটজুরীর প্রস্তর-বাধ এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। নদীগর্ভ হইতে প্রস্তর রাশি অতি স্নকৌশলে ক্রমশঃ স্তম্ভীকৃত করিয়া, এখন স্নদুচ্চরূপে, মহাঘোর বুদ্ধি কটক সহরকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে যে, বর্ষাকালে মহানদী ও কাটজুরীর প্রবল বস্ত্রাঘাতে শত শত বৎসর আঘাত করিয়াও ইহার এক ধানি প্রস্তর স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই। এই স্নদুচ্চ এবং আশ্চর্য্য কৌশল-নির্মিত প্রস্তর-বাধ দ্বারা যদি কটক নগরী সুরক্ষিত না থাকিত, এতদিন কটকের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইত। বর্ষা কালে কটকের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে নদীর প্রবল তরঙ্গ বহিতে থাকে। কখন কখন কটকের সমস্তই হইতে জলরাশি উর্দ্ধে আরোহণ করে। এই জলরাশিকে এই বাধ বুক পাতিয়া বাধা দিয়া সহরকে রক্ষা করে। উড়িষ্যার হিন্দু কীর্ত্তির এই প্রথম লীলা। এই প্রথম লীলা দেখিয়া আমরা বিশ্বসম্পূর্ণ নয়নে অল্প সময়ক কহিতে পারি নাই।

মারহাট্টাদিগের সময়ের সৈন্ডাগার কটকের দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কীর্ত্তি।

শ্রেণীবদ্ধ খিলানময় ইষ্টক নির্মিত স্তূপ ও অতি মনোরম সৈন্তাগার দেখিলে ইংরাজদের সৈন্তের ব্যারাক্কে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

কটকের তৃতীয় দৃশ্য, কেলা। কেলায় সৌন্দর্য ইংরাজেরা একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কেলা বিলাসের লীলাঙ্গল বল-জীড়ার ক্ষেত্র রূপে পরিণত। কেলায় চতুর্দিকে পরিখা, কেলায় মধ্যের একটা ভজনালয়, এবং ভগ্ন কামানাদি এখনও প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী মূহু ভাবায় কীর্তন করিতেছে। কেলা—মহানদী-নদীর উপরে। নদীর অপর তীর হইতে সৈন্তা-ক্রমণ রক্ষা করিবার এমন স্কন্দর স্থান আর নাই। স্বর্ঘ্যাস্তের প্রাক্কালে, কেলায় মধ্যস্থিত একটা মৃত্তিকা-স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ভারতের সূপ্ত গৌরব স্মরণ করিলাম। মনে হইল, সে মৃত্তিকা-স্তম্ভ নয়, যেন প্রাচীন গৌরবময় বংশপরম্পরার অস্থি রাশি স্তম্ভীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আহা, সেই সকল গৌরব কোথায়, আর আজ আমরা কোথায়! ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা স্বাধীন ছিল, আর আজ ইংরাজ-প্রভাপের নিকট অবনত-মস্তক। ক্ষণ-কাল এই সকল কত কি ভাবিলাম। এ দিকে দূরবর্তী পাহাড় শ্রেণীর উপর দিয়া, বিঘাদ-মাথা স্বর্ঘ্যকিরণ, শেষ রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া, মহানদীকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর মলিনতার আবৃত করিয়া, এবং আমাদের প্রাণকে কি এক নিরানন্দ, কি এক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করিয়া নির্কারণ লাভ করিল। আমরা বাস্তব হইয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। ভারতের জন্ম যে হিন্দু বংশ শেষ রক্ত দিয়াছিলেন, এবং হিন্দু রাজত্বের ষাঁহারা শেষ প্রতাপশালী রাজা, সেই চিরোজ্জ্বল পবিত্র বংশের কোন ক্রুতী এবং সহৃদয় ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিয়া কয়েক দিন কটকে বড়ই বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের শোণিত এখনও যেন উষ্ণ, এখনও তাঁহাদের প্রাণ ভারত-মমতায় পরিপূর্ণ, এখনও যেন তাঁহারা প্রতি-ভার পূর্ণাবতার, এখনও যেন তাঁহারা আর্ঘ্য-মহিমায় প্রদীপ্ত।—আর আমরা? বংশপরম্পরার আর্ঘ্যমহিমা, আর্ঘ্য প্রতিভা ও গুণরাশি বিশ্বতিমাগরে ভাসাইয়া এখন ইংরাজ পদানত কি এক আশ্রয়্য জীব! কত ভাবিলাম, কত কাদিলাম, পৃথিবীর কে তাহার সংবাদ রাখে?

কটকের জৈনমন্দির খুব প্রাচীন না হইলেও একটা স্কন্দর দৃশ্য বহু স্বটে। কটকে হিন্দু দেবদেবীর যে সকল মন্দির আছে, তন্মধ্যে গোপালজীর মন্দির প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাংশ

মন্দিরই পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দ্বারা নির্মিত । কটকের মন্দির সমূহ দেখিলেই উড়িষ্যার হিন্দুধর্মের আধিপত্যের উজ্জল পরিচয় পাওয়া যায় ।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা ইংরাজ করত্ববলে পতিত হয় —মহারাষ্ট্রীয় বিজয় নিশানের স্থানে ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয় । সেই সময় হইতে কটকের বর্তমান সমৃদ্ধির সূত্রপাত । কলিকাতা যেমন বাংলার রাজধানী, কটক সেইরূপ উড়িষ্যার রাজধানী । কটক অতি বিস্তৃত স্থান ; কথায় বলে, এখানে বাগান বাজার, তিলান গলি । বাস্তবিক, কটকের বাজারের সংখ্যা অনেক । বাজার অপেক্ষা গলির সংখ্যা যে আরো অধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু এত বড় সহরেও ভাল পুকুর নাই । সাধারণতঃ লোকেরা পাতকুরার জল ব্যবহার করিয়া থাকে । কটকের মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত খুব ভাল বলিয়া বোধ হইল না, অনেক রাস্তা এখনও মৃত্তিকা নির্মিত, পরনালার বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই । কটকের বামু ভাল বলিয়া বহু অধিবাসী স্বর্ষেও কটক অস্বাস্থ্যকর হয় নাই । উড়িষ্যা বিভাগের কমিসনারের আফিস, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারী, ম্যুন্সিফ কাছারী ও কলেজ গৃহ, এ সমস্তই বর্তমান গৌরবের নিদর্শন । কমিসনারের কাছারী মহানদীর নিকট ; ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির কাছারী কলেজের নিকট, কাটজুরী নদীর তীরে সংস্থাপিত । ম্যুন্সিফ ও জজের কাছারী এই উত্তর কাছারীর মধ্যবর্তী স্থানে । কটকের উচ্চশ্রেণীর কলেজ, মেডিকেল স্কুল তিনই আরো ৪৫ টা এন্ট্রান্স স্কুল স্থানীয় উৎসাহী লোকদিগের যত্নে সংস্থাপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্যারীমোহন একাডেমির নাম বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত । ইনি নিজের শরীরের রক্ত দিয়া এই স্কুলের ভিত্তি সংস্থাপিত করেন ; ইহার জন্ত তাঁহার অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে । তিনি অতি সংলোক ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন । এখন তিনি স্বর্গে, কিন্তু তাঁহার বহু-প্রযুক্ত স্কুলটি এখনও চলিতেছে । খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগের অনেক কীর্তি এখানে বিদ্যমান আছে । নানা শ্রেণীর ভজনালয় ও স্কুলাদি তির একটা অপূর্ণ কীর্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম । হাজারিবাগে যেমন গবর্ণমেন্টের একটা রিক্রমেন্টরি আছে, এখানে সেইরূপ একটা অনাথ-নিবাস (Orphanage) আছে । এই অনাথ-নিবাসের গৃহ বহু অর্থে নির্মিত হইয়াছে । ইহা কোন সঁদাশর ইংরেজের সংকীর্্তি । কটকে একরূপ স্মরণ অট্টালিকা আর নাই । অনাথ বালক বালিকাদের জন্ত খ্রীষ্টসমাজ জগতে যে অপূর্ণ কার্য করিয়াছেন,

তাহার সমতুল্য কীর্তি আর কোন সমাজে দেখা যায় না। এই অনাথ-বিনাস, খ্রীষ্ট মিশ্যনরিগের ভজনালয় সমূহ, ইংরাজদিগের বসতি, এবং কেমার নিকটবর্তী ময়দানের সৈক-নিবাস সমূহ দেখিলে কটকে একটা খুব সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, কটক বঙ্গদেশের পর, বাঙ্গালার যে কোন নগরের সহিত সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যে সমকক্ষতা করিতে পারে। কটকে দেখিবার অনেক জিনিস আছে।

আমরা পূর্বে এক স্থানে বলিয়াছি, বাঙ্গালার যেমন গবর্ণমেণ্টের রেল-কীর্তি, উড়িষ্যার সেইরূপ খাল (Canal) কীর্তি। উড়িষ্যার নানা বিভাগের খালসমূহ সংরক্ষণের জন্য অনেক ইঞ্জিনিয়ার আকিস আছে। উড়িষ্যার খালকীর্তির সমতুল্য কীর্তি ভারতে অতি অল্পই আছে। খালাদি সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা রাখিল। কটকের উত্তরে মহানদী ও বিষ্ণুগার বাধ (Anicut) দেখিয়া ইংরাজ কোশল ও বুদ্ধিকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। কটকের বর্তমান শোভার প্রধান আকর মহানদী। এই নদীর জলরাশি পূর্বে সাগরে বহিয়া বাইত। বাধ দ্বারা এই জলরাশি আবদ্ধ থাকায় কটকে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজকীর্তি সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হইয়াছে। কটক প্রাচীন সময় হইতে শিল্পনৈপুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার রৌপ্য-নির্মিত অলঙ্কারাদি যে কোন প্রদেশের অলঙ্কারকে শ্রেষ্ঠতার পরাজয় করিতে পারে। কিন্তু শুনিলাম, উৎকৃষ্ট শিল্পীদিগের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী।

কটকে প্রেস ও স্থানীয় সংবাদপত্রের অভাব নাই। কটকের প্রিন্টিং কোম্পানি প্রেসের জন্য একটা সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। সেই বাড়ীর দ্বিতল গৃহটি যেন সহরের সাধারণ সম্পত্তি। এই স্থানে যে কেহ ইচ্ছা করিলে বক্তৃতা দি প্রদান করিতে পারেন। কটকের এই সুন্দর গৃহটি যেন কলিকাতার টাউন হলের স্থায় ব্যবহৃত। ইহার অধ্যক্ষ বাবু গৌরী-শঙ্কর রায় মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি দুই দিন বক্তৃতার জন্য এই হল আমাদেরকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একজন তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

কটকের অপর দিকের মধ্যে উড়িষ্যাবাসী, ভেলেকা, হিন্দুহানী ও বাঙ্গালীই প্রধান। ইহার মধ্যে নানা জাতির লোক আছে। ভেলেকা-বসতি দেখিলেই বোধ হয় যেন মাদ্রাজের অতি নিকটে আসিয়াছি।

দীর্ঘ ও কৃককার, বলবান, সাহসী ভেলেঙ্গা জী পুরুষদিগকে দেখিলে মনে অনেক পূর্বের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ইহারাই বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা বিজয়ের ইংরাজের প্রধান অস্ত্র। এখনও ভেলেঙ্গা-সৈন্যে বহু লোক ইংরাজ-সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত। কটক ভেলেঙ্গা সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত। নিজের শোণিত নিজেরা পান করিতে ভারতবাসী যেমন মজ্বুত, পৃথিবীর আর কেহ তেমন আছে কিনা, জানি না। ভারতবাসীর দ্বারা বদেশজোহী বুঝি বা বিধাতার সৃষ্টিতে আর নাই। উড়িষ্যাভ্রমণে বাইরা সমুদ্র-চর ভেলেঙ্গা-দিগের সাহসের প্রশংসা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু এমন মূর্থ এবং অজ্ঞান জাতি আর ভারতে আছে কি না, কে জানে! তবে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহেব-সহবাসে থাকিয়া ইহার বাহিরের সভ্যতা যথেষ্ট শিখিয়াছে।

কটকের বাঙ্গালী শ্রেণী আমাদের দেশের গৌরব বিশেষ। অতিশয় সুবস্ত্রী, বাকুব-বিহীন প্রদেশে বাইরা ইহাদের সমুদয়তা ও চরিত্রের সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতি নগরে, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুলক, কুল বা কলেজের শিক্ষক প্রভৃতিই উচ্চ শ্রেণীর লোক মধ্যে গণ্য। অনেক নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ অহঙ্কারী, অত্যাচারী, ক্ষুণ্ণভাবী, মদ্যপায়ী, বেভ্রাসক্ত এবং ধর্মহীন। বলিতে সঙ্কোচ এবং লজ্জা হয় যে, বাঙ্গালার বড় বড় সহর গুলি যদ বেভ্রার ঘোতে যেন সদা ভাসমান এবং আমাদের দেশের আশা ভরসা বাহারা, সেই শিক্ষিতাতিমানী, উচ্চ শ্রেণীর উকীল ও হাকিমেরা সেই কলঙ্ক-ঘোতে উল্লসিত চিত্তে নিমগ্ন। অনেক স্থানের এইরূপ বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া আমরা অশ্রু সঞ্চার করিতে পারি নাই। কিন্তু উড়িষ্যার রাজধানী, পুরী, কটক, বালেশ্বর ও উড়িষ্যার সংলগ্ন নাগপুরের রাজধানী রাঁচি ও হাজারিবাগ পরিদর্শন করিয়া তত্তৎ স্থানের অধিকাংশ বাঙ্গালীর নির্মল বিশুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আমরা বিশেষ আশ্চর্য্য লাভ করিয়াছি। কটকের বাঙ্গালী উকীলগণের মধ্যে বাবু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিবল্লভ বসু, বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের বিশুদ্ধ নির্মল চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য লাভ করিয়াছি। হরিবল্লভ বাবু কটকের প্রধান উকীল, কিন্তু ইহার ব্যবহার ও চরিত্র অতি চমৎকার। বাবু নরেন্দ্র নাথ সরকার কটকের মধ্যে কবিতুল্য চরিত্রের

অধিকারী। কটকের বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অতি সৎলোক। কটকের মুন্সেফ বাবু মতিলাল সিংহ অতি মধুর প্রকৃতির লোক। দূরদেশে যাইয়া আমরা এরূপ সহৃদয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিয়াছি। মতিবাবু কটকের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অমায়িকতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সর্বত্র পূজিত। এরূপ লোক বঙ্গভূমির উজ্জল রত্ন স্বরূপ। বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় একজন ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তি। ইহার সহিত অল্প কথোপকথনেও আমরা সুখী হইয়াছি। এই সকল মহাত্মাদিগের দ্বারাই কটকে বাঙ্গালীর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎকল-বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বাবু নন্দকিশোর দাস, বাবু মধুসূদন দাস মহাশয়গণ আদর্শ ব্যক্তি। ইহারাই উড়িষ্যাবাসীর প্রতিভা, উচ্চ শিক্ষা এবং চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ। এমন লোক নাই, যাহারা ইহাদের ব্যবহারে সন্দেহ না হইয়াছেন।

উড়িষ্যাতে বহুকাল হইতে অনেক বাঙ্গালীর চিরকালের জন্য বাড়ী নির্মাণ করিয়া বংশপরম্পরা ক্রমে বাস করিতেছেন। কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট শুনিলাম, এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র হইবে। উড়িষ্যা এই বাঙ্গালীদিগের নিকট সভ্যতা ও সামাজিক বিষয়ে যে প্রভূত রূপে ঋণী, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। কটকের বাবু রাধানাথ রায়, বাবু জগমোহন রায়, বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীভুক্ত। রাধানাথ বাবু বর্তমান সময়ে উড়িষ্যার প্রধান কবি, ইনি স্কুল সমূহের জয়েন্ট ইনস্পেকটর। দীন বাবু কোন সরকারী কাজ করেন না। জগমোহন বাবু পূর্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই তিন জন লোকের নিকটই আমরা বিশেষ রূপে ঋণী। দীন বাবু উড়িষ্যার মঙ্গলের জন্য যে সকল সংকার্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই মহাত্মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কটক পরিদর্শনের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইনি কুলি-অত্যাচার নিবারণে বন্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এই কার্যে বাবু ললিত মোহন চক্রবর্তী তাঁহার প্রধান সহায়। রাধানাথ বাবু উড়িষ্যার মধ্যে একজন বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার নির্মল চরিত্রের সংস্পর্শে, তাঁহার মধুর ব্যবহারে, তাঁহার অভিজ্ঞতার ছায়ায় থাকিয়া আমরা জীবনোন্নতি এবং উড়িষ্যা পরিদর্শন সম্বন্ধে অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, রাধানাথ বাবু মত লোক উড়িষ্যায় অতি অল্প আছেন।

অগমোহন বাবু বৃদ্ধ, কিন্তু উৎসাহের জীবন্ত অবতারণা। এমন সংকাজ নাই, বাহাতে তাঁহার সহানুভূতি নাই। বেষ্ট্রাঙ্গিণের পালিত মেয়েদ্বয়কে ক্রুরপে উদ্ধার করা যায়, বর্তমান সময়ে এই সাধু চিন্তায় তিনি ব্যাপ্ত। ইনি কটক ব্রাহ্ম-সমাজের আদি বিভাগের একমাত্র আদর্শ সভ্য। কিন্তু ইহার প্রাণ এখন সার্বভৌমিক ধর্মের জন্য লালায়িত। কয়েক দিন ইহার সংস্পর্শে থাকিয়া আমরা অনেক উপকার পাইরাছি।

কটকের ব্রাহ্ম-সমাজে ও ছাত্র সমাজে অনেক চরিত্রবান লোক আছেন। কতিপয় অধ্যাপকের যত্নে নীতি শিক্ষার জন্য একটা হরি-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোপালকীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এই সভার অধিবেশন হয়। ধর্মের জন্য যিনি বাহা করেন, তিনিই সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। কটকের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু মধুসূদন রাও মারহাট্টাবংশের গৌরব বিশেষ। ইনি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন চরিত্রবান ব্যক্তি। যে সকল মহাত্মার পূণ্যপ্রভার ব্রাহ্ম-সমাজের সুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমরা ইহার বাসাতেই আশ্রয় পাইরাছিলাম। মধু বাবুর জ্ঞান সজ্জন ব্যক্তির মধুর ব্যবহার জীবনে ভুলিবার বো নাই। ইনি একজন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি। উড়িয়া ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী; ইনিও একজন উড়িয়া ভাষায় উৎকৃষ্ট কবি।

কটকের কলঙ্কের কথা এই যে, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির অতি নিকটে ও সহরের অতি সুন্দর প্রকান্ত স্থানে, সদর রাস্তার উপরে, বেষ্ট্রালয় অতি গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা বড়ই মর্শাহত হইরাছি। তুনিলাম, উড়িয়ার অনেক রাজা রাজড়ার ধন প্রাণ এই স্থানে বিসর্জিত হইয়াছে। কটকের এই কলঙ্ক দূর করিতে কটকের সম্রাট লোকেরা চেষ্টা করিলে যে কৃতকার্য হইতে পারেন না, আমরা মনে করি না। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি অতি কম।

কটকের আর একটা কলঙ্ক এই দেখিলাম, ভক্ত পরীতে প্রকান্ত রাস্তার ধারে বেষ্ট্রার নাচ হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণের চিত্ত কলুষিত হয়, ক্রটি অপবিভ্র হয়। বাঙ্গালার বড় লোকের বৈঠকখানায় খেমটা নাচ প্রভৃতি যে কলঙ্ক লীলার অভিনয় দেখা যায়, কটকের রাস্তার ধারে সে চিত্র দেখিলাম। এ সবক্কে বাঙ্গলা অপেক্ষা কটককে একটু কলুষিত বলিয়া বোধ হইল। বাহা হউক, কটকের স্থিতি আমাদের ক্ষম্যে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে।

ভুবনেশ্বর ।

এইবার আমরা উড়িষ্যার অতুল কীর্তিময় স্থানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি। আমাদের লেখনী কল্পিত হইতেছে, কল্পিত সঙ্কলিত হইতেছে। এই অভ্যাশ্রম্য কীর্তিকাহিনী ষথায়থ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিব না, কিন্তু অন্তকে বলিতে বা বুঝাইতে পারিব, সে আশা নাই। তবে এ চেষ্টা কেন? বিড়ম্বনা মাত্র।

উড়িষ্যা যাত্রার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইবার আরম্ভ হইল। জাহাঙ্গীর পালা শেষ হইয়াছে, এই বার গরুর গাড়ীর পালা আরম্ভ হইল। কটক প্রিন্টিং কোম্পানির হলে “যুগধর্ম” বিষয়ে দেড়-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা শেষ করিয়া ক্লাস্ত কলেবরে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। শ্রদ্ধেয় জগমোহন বাবু বক্তৃতার গৃহ হইতে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মনে কিছুই উদয় হয় নাই। বাসায় বাইয়াই, কাহার আদেশে কে জানে, আমাদের বন্ধু জগমোহন বাবু মধু বাবুকে এই রূপ এক খানি পত্র লিখেন—“আমাদের বন্ধুরা পুরী যাত্রা করিবেন, সঙ্গে কুইনাইন, সাণ্ড, স্পিরিট ক্যান্ডর ও ক্লোরোডাইন দেওয়া উচিত।” জগমোহন বাবু এই রূপ সহদয় ব্যবহারে বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানান হইল, কিন্তু ঔষধাদির বিশেষ কোন চেষ্টা হইল না; তিনি অগত্যা এক শিশি ক্লোরোডাইন ও এক শিশি স্পিরিটক্যান্ডর সঙ্গে দিলেন। এই সময়ে বুঝিলাম না, সঙ্গে ঔষধ পথ্য না লইয়া আমরা কি বিষয় ক্রটি করিলাম। উষ্ণ রক্তে, নির্ভাবনার, আহারান্তে ক্লাস্ত ও অবসন্ন দেহ খানিকে গো-শকটে তুলিলাম। বন্ধুগণ বিদায় দিলেন; মধু বাবু সঙ্গে একটা বন্ধুকে পাঠাইলেন। এক গাড়ীতে আমরা তিনজন। আমি, আমার বন্ধু ও পরিদর্শক-বন্ধু। এতদ্বিধি গাড়োয়ান। গরু বেচারাদের সাধা কত, একবার বুঝুন। কটকের দক্ষিণে কাঠজুরী নদী। এই নদীর অর্ধ মাইল-ব্যাপী বালুময় বন্ধ শকট হইতে নামিয়া পদব্রজে বাইতে হয়। আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, মৃতবৎ গাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম। বন্ধুস্বর অতি কষ্টে সেই দ্বিপ্রহর অন্ধকারময় রজনীতে কতকটা জলময় ও কতকটা জলশূন্য বালুরাশি

অতিক্রম করিলেন। নদী বন্ধ অতিক্রম করিয়া বহুগণ গাড়ীতে উঠিলেন। ধীরে ধীরে, ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে, পূর্বীর রাস্তা ধরিয়া গাড়ী চলিল। কিয়ৎদূর বাইরা শুনিলাম, দূরবর্তী কোন গাড়ীতে চুনি হইয়া গেল। এরূপ বিপদ সে নিৰ্জন পথে প্রায়ই ঘটে।

গাড়ীতে অতি কষ্টে তিন জন পড়িয়া রহিলাম। আমার সঙ্গে বন্ধু রায়ে বলিলেন, বড় শীত। আমি বড় ক্লান্ত, কথাটার বড় কাণ দিলাম না। এই ভাবে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতে বন্ধুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, বন্ধুর তরানক জ্বর হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের গাড়ী বালি-হস্তা চটা পার হইয়া পূর্বীর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া ভুবনেশ্বরের রাস্তা ধরিয়াছে। প্রবাদ এই, এই বালিহস্তার বামচক্রে বালি রাজাকে বধ করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা বিধাতা জানেন, আমরা বালিহস্তা পার হইয়া আবার বালিময় জলপ্ত নদীবন্ধ দিয়া গাড়ী চালাইয়া দিলাম। এ নদীও কাঠজুরীর একটি শাখা বিশেষ; বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হয়, কিন্তু এখন শুষ্ক। এই বালুময় নদী পার হইবার সময় দলে দলে ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ আসিয়া আমাদের গায়ে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিষ্ণু-মাগরে দান করাইব, ভুবনেশ্বর দেখাইব, ইত্যাদি নানা প্রলোভনমূলক কথা বলিতে লাগিল। নিবাস কোথা, তোমাদের পাণ্ডা কে—ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন তাহারা করিতে লাগিল। উত্তর না দিলে ছাড়ে না, কেই বা এত পাণ্ডার এত কথার উত্তর দেয়? দিতেই বা কে পারে? তাতে আবার আমাদের একজন বন্ধু পীড়িত। বালুময় নদী পার হইতে গরু হুটা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এই অবস্থায় গাড়োরানের প্রহার; এদিকে সূর্য্য আরক্ত লোচনে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া মন্তকের উপরে তীব্রবেগে ধাবিত হইয়াছেন, বন্ধুর শরীর দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে, আর এদিকে এই পাণ্ডাদের উৎপাত। বড়ই বিরক্ত হইলাম। পীড়িত বন্ধু কোন পাণ্ডা-শিশুকে ভীষণ বিতীষিকা দেখাইলে, সে পলায়ন করিল। ক্রমে ভুবনেশ্বর নিকটবর্তী হইল। জরের ঔষধ নাই, পথ্য নাই—দেখার সাধ মিটিয়াছে, এখন কি করি, কোথায় যাই, কেন পূর্ন রজনীতে জগমোহন বাবুর পরামর্শ শুনি নাই, এই সকল বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময়ে ভুবনেশ্বরের বন্দিরের চুড়া দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা ১০ টার সময় সেই প্রাচীন অক্লুত কীর্তিময় স্থানে পৌছিলাম। সেখানেও পথ্য মিলিল না, ঔষধ

শিল্পি না, আমাদের বড় আশায় ছাই পড়িল। শেষে অগত্যা একটু “কন্দক” দিয়া পীড়িত বন্ধুকে জল খাওয়াইলাম, এবং অতি সংক্ষেপে ভুবনেশ্বরের মহা কীর্তি সকল দেখিলাম। দিবসে অন্নাহার হইল না। সামান্তরূপ জলযোগ করিয়া দিন কাটাইলাম। কিন্তু তাহাতে একটুও কষ্ট হইল না। ভুবনেশ্বরের কীর্তি এমনই মনমুগ্ধকর।

মহারাজ যজ্ঞাতি কেশরী ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই জগন্নাথ দেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। যজ্ঞাতি কেশরী তাঁহার জীবনের এই শেষ কীর্তি পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫৭ বৎসর পর মহারাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে এই মন্দির সম্পূর্ণ হয়। ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ এই মন্দির নির্মাণে বিলুপ্ত হয়, চতুর্থ পুরুষ সমাধা করেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের দ্বার বড় শিবলিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় মন্দির সমূহের মধ্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট।

ভুবনেশ্বর, কেশরী বংশের সময়, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। পাণ্ডাদের যুগে শুনিলাম, এক সময়ে একটা কম কোটা শিব-মন্দির ভুবনেশ্বরের পার্শ্ব-বর্তী স্থান সমূহে বিদ্যমান ছিল। মহাত্মা হট্টার সাহেব ৭০০০ সাত সহস্র মন্দির গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কেশরী বংশ উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু এ সময়েও বৌদ্ধধর্মের প্রকোপ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। মন্দির সমূহের গায়ে যে সকল ছবি বিদ্যমান আছে, তাহা বৌদ্ধ মূর্তির দ্বারায় অঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়েও অগ্নীল ছবি আছে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প। ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ হইবে। প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল এত উচ্চে ক্রুরূপে উখিত হইল, তাবিলে অবাক হইতে হয়। পাণ্ডাদের যুগে শুনিলাম, প্রায় ৪ মাইল দূর হইতে সোপান নির্মাণ করিয়া এই সকল প্রস্তর উত্তোলন করা হইয়াছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে তদনীন্তনের শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়; এমন একখানি প্রস্তর দেখিলাম না, বাহাতে আশ্চর্য্য কাকর্ষ্য বা কোনরূপ ছবি অঙ্কিত নাই। এই মন্দিরের দুই পার্শ্ব ও পশ্চাতে তিন দিকে পার্কতী, গণেশ ও কার্তিকের তিনটা অপূর্ণ বৃহৎ প্রস্তর মূর্তি আছে। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্তি অতি বিরল। পার্কতীর অঙ্গের বস্ত্র খানিতে এত উৎকৃষ্ট কাকর্ষ্য রহিয়াছে যে, অল্প কোন

ছষ্ট বস্ততে সেরূপ শিল্পনৈপুণ্য সম্ভবে না। অতি ক্ষুদ্র অংশের অকরক পর্যন্ত আশ্চর্যরূপ বিকাশ করা হইরাছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্মিত বাঁড় রহিয়াছে; এরূপ আশ্চর্য পাৰাণ-নির্মিত বাঁড় আমরা আর কোথাও দেখি নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য, প্রাচীনত্ব, অপরূপ শোভা দেখিয়া ও তাবিয়া অবাচ্ হইলাম। কেশরী বংশ ধর্মের জন্ত কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তাবিয়া বিস্তৃত হইলাম। ভুবনেশ্বরের এক মাইলের মধ্যে কোন রূপ বড় পাহাড় নাই। এই সকল মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড সকল বহুদূর হইতে আনীত হইয়া থাকিবে। কত অর্থ যে এই কার্যে ব্যয়িত হইরাছে, কল্পনা করা যায় না। ধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্ত ভারতের লোকেরা যে কি না করিয়াছে, জানি না। ধন্ত ভারতবর্ষ, ধন্ত ভুবনেশ্বর।

ভুবনেশ্বরের নিকটে যে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে সংক্ষেপে সে সকল সম্বন্ধে হই একটা কথা না বলিলে চলে না। অধিকাংশ মন্দির অরণ্যে বেষ্টিত হইরাছে, অনেক মন্দির ধূলিসাৎ হইরাছে। এই সকল মন্দিরের বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, প্রস্তর রাশিকে কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করা হইরাছে, কিন্তু কোন প্রকার মসলা প্রয়োগ করা হয় নাই। সহস্রাধিক বৎসরের প্রবল পরাক্রমও এই অপূর্ণ কীর্তিকলাপকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। কালাপাহাড়ের দৌরাছো কোন কোন মূর্তি অঙ্গহীন হইরাছে বটে, কিন্তু অনেকগুলি মন্দির এখনও সমভাবেই আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দির এমন স্নানরূপে আশ্চর্য কৌশলে নির্মিত যে, চুর্জর কালকে পরাক্রম করিয়া এতদিন একই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, একখানি প্রস্তরও হানপ্রট হয় নাই। দেখিলে বোধ হয় যে, কখনও ইহা ধ্বংস বা বিনষ্ট হইবে না। এরূপ কীর্তি পৃথিবীতে আর কতটা আছে, জানি না।

যে কথা বলিতেছিলাম। অস্তান্ত যে কোন মন্দিরের প্রতি তাকাও না কেন, তাহা দেখিয়াই মোহিত হইবে। সামান্ত সামান্ত যে সকল মন্দির দেখিলাম, তার সমতুল্য মন্দির বাঙ্গালার একটাও দেখি নাই। অসংখ্য মন্দিরের অসংখ্য নাম। প্রতি মন্দিরেই নিবিলম্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ নাম গণিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, শেষে পরিত্যক্ত হইলাম। সহস্র সহস্র নাম স্মরণ রাখা বা লিপিবদ্ধ করা, উভয়ই অসম্ভব।

মন্দির সকলের মধ্যে কেদার গৌরীর মন্দির সম্বন্ধে কিছু বিশেষণ আছে। কেদারকুণ্ডের জল পরিষ্কার, কোন ঝরণা বহিয়া আসিতেছে; স্থানটা বড়ই নির্জন, অনেক প্রাচীন বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। ইহার নিকটে আর একটা কুণ্ড আছে। জনশ্রুতি, অশোক অষ্টমীর দিন বক্ষ্য্য জীলোক এই কুণ্ডের জল পান করিলে সন্তান-সম্ভবা হয়। এই জন্ত অশোক অষ্টমীর দিন এই কুণ্ডের জল বহু মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সময়ে এই স্থানে একটা মেলা হয়। কেদার গৌরী সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্রবাদ আছে। কেদার এক জন রাজপুত্র, গৌরী এক রাজকন্যা। বাল্যকালে ইহারা একত্রে আহার বিহার করিতেন। বাল্যকালে উভয়ের মধ্যে মধুর ভালবাসা ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে সেই ভালবাসা রূপান্তর ধারণ করিল। অর্থাৎ বাল্য ক্রীড়া হইতে উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় জন্মিল। কিন্তু কৌলিক প্রথা বিবাহে বাধা জন্মে। সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করিয়া পলায়ন করিতে প্রস্তুত হন। গৌরী অগ্রে বাহির হইয়া নিকটবর্তী কোন নির্দিষ্ট জঙ্গলে গমন করেন। তাঁহাকে ব্যাঘ্র তাড়না করে। ভয়ে তিনি কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করেন। রক্তাক্ত বস্ত্র কণ্টকে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কেদার অরণ্যে আসিয়া গৌরীকে না দেখিয়া এবং রক্তময় বস্ত্র দেখিয়া মনে করেন যে, গৌরী ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইয়া থাকিবেন। তিনি হতাশ প্রণয়ে আত্মহত্যা করেন। গৌরী আসিয়া কেদারের মৃত দেহ দেখিয়া শোকে অধীর হন, এবং তিনিও আত্মহত্যা করেন। ক্রমে যখন রাজধানীর লোকের অসুসন্ধানে উভয়ের মৃত দেহ পাওয়া গেল, তখন প্রণয়ী যুগলের স্বর্গীয় প্রেমের পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ হইল। কেদার গৌরীর প্রেম অক্ষয় করিবার জন্ত উভয়ের প্রস্তর মূর্তি নির্মাণ করিয়া ছুটি সন্মুখবর্তী মন্দিরে স্থাপন করা হইল। এই গল্প সত্য, কি মিথ্যা, জানি না, কিন্তু দেখিলাম, কেদার ও গৌরীর মূর্তি আশ্চর্য্য রূপে নিৰ্ম্মিত। এইস্থানে প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলাম। কেদারকুণ্ডের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিয়া শীতল হইলাম ও এই নির্জন স্থানে অনেক সময় কাটাইলাম। কত কথা যুগপৎ মনে উঠিতে লাগিল। কেদার গৌরীর স্বর্গীয় প্রেম কাহিনী আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। ভাবিলাম, কোথার কেশরী বংশ, কোথার উড়িষ্যার রাজধানী, কোথার প্রাচীন আৰ্য্য ধর্ম্মভাব, কোথার প্রেম, কোথার পুণ্য, কোথার পবিত্রতা! হৃদয়ে কত স্বপ্ন জাগিল, কত কথা উঠিল, ভাবিয়া ভাবিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিলাম। ইচ্ছা ছিল,

সমস্ত দিন কেদারকুণ্ডের তটে বসিয়া কাটাই, কিন্তু শকটে পীড়িত বহুকে বৃক্ষ-ছায়ার রাধিয়া গিয়াছি—আর থাকিতে পারিলাম না। আর কি করিব, ভুবনেশ্বরের আশ্চর্য্য প্রেম-কীর্ত্তি সেই কেদার-গৌরীর শ্রমানে, শ্রদ্ধার সহিত, কয়েক বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া শূন্ত প্রাণে ফিরিয়া আসিলাম।

ভুবনেশ্বরের আর কি পরিচয় দিবার আছে? বিন্দু-সাগর সম্বন্ধে একটা কথা। সহস্রাধিক বৎসর বন্ধের উপর দিয়া বহিতে দিয়া অগ্নান চিহ্নে বিন্দু-সাগর একটা মন্দির বন্ধে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—আজও কত জনকে আপন শীতল পুত্ৰ হারিতে স্নান করাইয়া দেব দর্শনে পাঠাইতেছে।

ভুবনেশ্বর শিবধাম, সূত্রাং এখানে শক্তির কোন চিহ্ন নাই। শুনিলাম, বৈতাল-মন্দিরে কিছু শক্তি-চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহা দর্শন করি নাই। বাজপুর পার্শ্বতীর্থ, ভুবনেশ্বর শিবধাম, কণারক সূর্য্যধাম, পুরী বিষ্ণু-ধাম, মহাবিনায়ক পর্বত গণেশধাম, এই কয়টা উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ। ভুবনেশ্বরে প্রায় ৩০০ ঘর পাণ্ডা আছে। এখানে একটা সামান্ত স্কুল ও একটা সামান্ত পোষ্টাফিস আছে। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের যত্নে আমরা বিনা খরচে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতে সমর্থ হইলাম, এবং রাজ্যে প্রসাদ পাইলাম। সেই পাণ্ডার দোরাশ্রম্যর স্থানে, বহু বাক্যবহীন মহাশ্রমানে, এই সদাশয় লোকটাকে যেন মক্‌ভূমির ওয়েসিসের জ্ঞান বোধ হইল। এই দিন ঋগুগিরি ও কপিলেশ্বর দর্শন করিয়া রাজ্যে ভুবনেশ্বরের পোষ্টাফিসে অবস্থান করিলাম। পীড়িত বহুর পথের জন্ত আর কিছুই পাওয়া গেল না, রাজ্যে কয়েকটা মুরকী খাওয়ান গেল এবং কয়েকটা হরিতকী রাজ্যে বাটিয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্নে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা ঋগুগিরি বর্ণন কালে লিপিবদ্ধ করিব। ভুবনেশ্বরের কাহিনী এই পর্য্যন্ত শেষ।

ঋগুগিরি ও উদয়গিরি ।

অপরাহ্নে আমরা ঋগুগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পীড়িত বহুকে গাড়ীতে রাধিয়া আমি সেই পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ ধরিয়া ভুবনেশ্বরের অন্তান্ত ঐষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখিয়া লইলাম। ভুবনেশ্বরে বাঙ্গালীর একটা অক্ষরকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। বিন্দুসাগরের তীরে ইহা সংস্থাপিত; ইহার

অন্য নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ সেন রাজগণ নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—“সার্ব গোত্রীয় “ভবদেব ভট্ট বালবল্লভী ভূজঙ্গ” নামক জনৈক ব্রাহ্মণ উড়িষ্যা দেশস্থ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী বিন্দুসরোবর তীরে অনন্ত বাহুদেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরশিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে, সার্ব গোত্রের ভট্ট ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই মন্দির অব্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া উড়িষ্যা বক্ষে বাঙ্গালীর কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।”

ভুবনেশ্বরের সমস্ত দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখা হইলে একটা বিস্তল গৃহের উপর উঠিয়া ভুবনেশ্বরের একটা জীবন্ত ছবি চিরকালের জন্য প্রাণে আঁকিয়া লইলাম। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ তখন অন্ন অন্ন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল ; মন্দির রাশির উপরে, দূরের প্রান্তরে, আরো দূরের পাহাড়-শিখরে সেই রশ্মি তপ্তকাকনের স্তার শোভা পাইতেছিল। বতদূর দেখা যাইতে লাগিল, সব যেন অনন্তকালস্থায়ী কীর্তি রাশিতে পরিপূর্ণ। এই স্থান হইতে ঋগ্-গিরির দৃশ্য অতি মনোহর—যেন আকাশের গারে দুই খণ্ড নীল-মেঘ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, আর সেই মেঘের সহিত অস্তিম সূর্য্য প্রাণ ভরিয়া কোলাকুলী করিয়া কোন্ অদৃশ্য জগতে প্রয়াণের জন্য বিদায় লইতেছে। ঋগ্গিরি গমনোদ্যত সূর্য্যের বিচ্ছেদে অধীর ও চঞ্চল হইয়া আপন বক্ষে, বৃক্ষের শিরে সেই রশ্মি ধরিতে চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু সূর্য্য ঐ বার, ঐ বার, ঐ ডুবে, মেঘের আড়ালে, কি জানি কেন, ঐ সুকার !! কাজেই ঋগ্গিরির শরীরের পূর্বার্দ্ধে কে বেন মলিন বিবাদের ছায়া, গাঢ় আঁধার, সচঞ্চল কুরাসা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে লেপিয়া দিতেছে। পশ্চিম দিকে এই শোভা, পূর্ব দিকে, অনেক দূরে ক্ষীণরশ্মির কোলে কপিলেশ্বরের মন্দির আকাশে মস্তক তুলিয়া কি বেন মুছ কথা মুছ ভাবার ঐ রশ্মির কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে। কতবার সূর্য্য উঠিয়াছে, এইরূপে কতবার ডুবিয়াছে—কত বৎসর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই প্রাচীন কীর্তিসাগর তবুও বেন সূর্য্যের জন্ত লালারিত। কণকাল ভাবিলাম, যে কীর্তিসাগর অনন্ত আঁধারের কোলে চির-নিমগ্ন, তার আবার রূপ দেখাইতে এত সাধ কেন ? যে জাতি পরগণে মস্তক বিক্রম করিয়া অন্তের কীর্তিতে ভূষিত

হুইতে আজ উন্নতি, সে জাতি কি এই কীর্তি দেখিয়া জাগিবে ? যে জাতি চিরতরে পরের বেশ পরীয়ে পরিয়া, পরের ভাষা কণ্ঠে ভরিয়া সাহসানে, লাহকারে মানবপদবীতে উত্থান করিতে প্রয়াসী হইয়া আধারসাগর গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে, সেই জাতি কি সোণার ভারতের এই সোণার কীর্তি স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিবে ? যে দেশের নৃপতিবর্গ সাহেব-নৃত্য, সাহেব-তোজ, ফিরিঙ্গি-সেবার জন্ত অকাতরে অগ্ন্যানচিত্তে অর্থরাশি কণ্ঠ-নাশার জলে প্রক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, সেই দেশের নৃপতিগণের অহঙ্কারের স্থানে লজ্জা বা বিকার জন্মিবে না, নিশ্চয় ! তবে আর কেন ? ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কপিলেশ্বর, তোমরা কেন আর আলোকের জন্ত লালারিত হইতেছ ? যে দিন গিয়াছে, সে দিন আর ফিরিবে না। এখন সূর্য্য প্রতারণা বেশ ধরিয়া ভারতে কেবল আধার লেপিয়া ফিরিতেছে, মায়া ছাড়িয়া এখন ক্ষণকাল আধারের সেবা করিতে থাক। অতি দ্রুত, মনে মনে পাগলের জ্ঞান এইরূপ কত কথা বলিতে বলিতে ভুবনেশ্বরকে অন্ধকারে ডুবিতে দিয়া, আমরা সেই গজেন্দ্রগামী শকটে আরোহণ করিয়া খণ্ডগিরির দিকে চলিলাম। ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির মধ্যবর্তী স্থান যেন মরুভূমির জায়—পাহাড়ও নয়, স্তম্ভলা স্তম্ভনা শস্ত-শ্রামলা প্রান্তরও নয়—না-মাঠ-না-পাহাড়, অথবা পাহাড়ও, মাঠও। সূর্য্যটা প্রাতে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছিল, এ বেলা কিছু ক্ষীণ, কিন্তু তবুও সেই রূপ বা ততোধিক জ্বালাতন করিতে লাগিল। একে অনাহার, তাহাতে আবার বন্ধুর জর, তাতে এখন এক গাড়ীতে পাঁচজন ! বন্ধুর গা দিয়া এই সময়ে যেন আগুন বাহির হইতেছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটা বন্ধু জর গায়েই দেখিয়া ছিলেন—খণ্ডগিরির একটা ছবি প্রাণে আঁকিয়া লইবেন, এখন এই ইচ্ছা। নিবেধ স্ববেও তাই তিনিও চলিয়াছেন। কিন্তু জর আজ খুব সময় বুঝিয়াছে,—যে আপন পরাক্রম দেখাইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না। গাড়ী জনপ্রাণীর বসবাস-শূন্য মরু সঙ্গ সেই না-মাঠ-না-পাহাড়ের মধ্য দিয়া, সূর্য্যের তীব্র ক্ষীণ রশ্মি ভেদ করিয়া, উদরে আগুন কণা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিল। বন্ধু তখন জরে ছটকট করিতেছিলেন, আমার প্রাণ তখন ভাবে বিস্তার। আমি গুণ গুণ করিয়া গান রচনা করিয়া পাগলের জ্ঞান গাইতেছিলাম—

“দেখা দেও নাথ, রক্ষা কর নাথ, তুমি বিনে আর কেবা আছে ?

আমি তোমাবিনে কিছু জানি না চে।

(বিগলকালে) ও নাথ তুমি বিনে আর গতি মাই হে ।” ইত্যাদি ।

বন্ধু অধীর হইয়া এই সময়ে আমাকে বলিলেন, “ভাই, মা তোমার কথা খুব শুনে, আমার জ্ঞাত প্রার্থনা করিতেছ না ?” আমি বলিলাম, “করিতেছি, কোন তর নাই ।” মায়ের কাছে সজলনেজে প্রাণ তরিয়া নীরব ভাবায় অনেক কথা বলিলাম । এ দিকে সন্ধ্যার প্রাকালে গাড়ী খণ্ডগিরির পাদমূলে, ডাকবাংলার নিকটে উপস্থিত হইল । রাস্তার ধারেই একটা যোগীর আশ্রম । আশ্রমের গৃহের দেয়ালে নানারূপ ছবি আঁকা । যোগী বলিলেন, বুদ্ধদেবের খড়ম এখানে আছে, দেখিয়া যাও । আমরা সে খড়ম দেখিলাম না, যোগীর কথা সত্য বলিয়া বোধ হইল না । এদিকে ভীষণ রাত্রি উপস্থিত হইতেছে ; সুতরাং খণ্ডগিরির অপূর্ণ কীৰ্ত্তিকলাপ দেখিবার জন্ত তৎপর হইলাম । পীড়িত বন্ধুকে হাত ধরিয়া পাহাড়ের কতকদূর তুলিয়া, ছই চারিটা গুহা দেখাইয়া, আবার গাড়ীতে রাখিয়া আমরা তিনজন পাহাড়ে উঠিলাম । গাড়োয়ান ও পীড়িত বন্ধু গাড়ীতে রহিলেন ।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দুটা সংলগ্ন ছোট পাহাড় । দুটিকে খণ্ডগিরির নামেই সাধারণত লোকেরা পরিচয় দেয়, এখান হইতে খোন্দা সব ডিবিজন পর্যন্ত একটা নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে । খণ্ডগিরিতে বেরূপ বৌদ্ধকীৰ্ত্তি বিদ্যমান, এরূপ আর কুজাপি নাই । হন্টার সাহেব বলেন, খণ্ডগিরিতে আর ১৮২টা ছোট বড় গুহা বিদ্যমান আছে । পাণ্ডারা বলা, ২০০ গুহা আছে । বোধে এলিফেন্টার যে সকল প্রাচীন গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই গুহা সকল তাহা হইতেও প্রাচীন । ৫৩৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বৌদ্ধদেবের মৃত্যু হয় । ২৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অশোকের রাজত্ব । এই সময়ে খণ্ডগিরির গুহা সকল খোদিত হয় । ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কেশরীবংশের রাজত্ব আরম্ভ । সুতরাং ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরির কত পরে, তাবিলে অবাক হইতে হয় । খণ্ডগিরিতে যে অসংখ্য গুহা বিদ্যমান আছে, তন্নধ্যে, অনন্ত-গুহা, ব্যাস-গুহা, হস্তি-গুহা, রাণী হংসপুরই প্রধান । অনন্ত গুহা ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইতে ১৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত খোদিত । ব্যাস গুহা ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে খোদিত । অনন্ত গুহা একটা প্রকাণ্ড কণাধারী সর্প-মূৰ্ত্তি ; হস্তিগুহা হস্তির আকৃতি, ব্যাস-গুহা ব্যাসাকৃতি । পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম, হস্তিগুহার উপরে অশ্লষ্ট ভাবায় অনেক কথা লিখিত আছে । ঐরা রাজার সময়ে অনেক গুহা খোদিত হইয়াছিল । হস্তিগুহাটা খুব প্রকাণ্ড, কিন্তু স্থানে স্থানে তর হইয়া গিয়াছে ।

তুর্নিলাম, ইংরাজ-কুলাঙ্গারেরা আগুন খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুকের আওয়াজে অনেক স্থান ভাঙ করিয়া ফেলিয়াছে। গুহাগুলি প্রায়ই অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পথিকেরা রক্তন করিয়া পাইয়াছে। এমন অতুল কীর্তির এই হৃদয় দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল।

খণ্ডগিরির গুহা সকলের মধ্যে সর্বাধিক আশ্চর্য্য কীর্তি রাণী-হংসপুর গুহা। এটা প্রকৃত প্রস্তাবে গুহা নহে; প্রকাণ্ড খিল চক মিলান বাড়ী-বিশেষ। চারিটা দর ১৪ ফিট লম্বা, ৭ ফিট পার্শ্ব, দেয়াল ৩—২ ফিট চওড়া। বারাগু ৬০ ফিট লম্বা, ৭ ফিট চওড়া। বারাগুর একদিকে দেওয়াল, একদিকে প্রস্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাম। এই সমস্ত বাড়ীটা পাহাড়ে খোদিত। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য ছবি বিদ্যমান, কোথাও যুদ্ধ হইতেছে, কোথাও বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে, ইত্যাদি অনেক অপকল্প খোদিত ছবি বিদ্যমান। ছবিগুলি ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছে বলিয়া ইন্টার সাহেব অনুমান করেন। ছবিগুলি যে কিছু আধুনিক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাণীহংসপুরের গুহা গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—প্রয়োজন হইলে যখন ইচ্ছা সেখানে বাস করা যায়। রাণীহংসপুর ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্য্যন্ত নির্মিত। খণ্ডগিরির হস্তিশূহার গায়ে যে অনুশাসন খোদিত হইয়াছিল, তাহা বড় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাণীহংসপুরের প্রতিকৃতির ধারে কোথাও কোথাও অনেক কথা লিখিত আছে। প্রবাদ এইরূপ তুর্নিলাম, ঐরা রাজার সময়ে রাণীহংসপুর খোদিত হয়। রাজা যখন সপরিবারে খণ্ডগিরিতে আগমন করিতেন, তখন এই রাণীহংসপুরে বাস করিতেন। খণ্ডগিরি হইতে ধউলি পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত একটি প্রকাণ্ড স্তর চলিয়া গিয়াছে। ধউলি পর্য্যন্ত খণ্ডগিরি হইতে ৫ মাইলের কম ব্যবধান হইবে না, খণ্ডগিরিতে এই স্তরের বিশেষ কোন পরিচয় না পাইলেও ধউলি পর্য্যন্তের উপরে এই স্তরের স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে দেখিয়াছি। খণ্ডগিরি দুই খণ্ডে বিভক্ত, পূর্বেই বলিয়াছি। একখণ্ডে এই সকল গুহারাজি বিদ্যমান, অপর খণ্ডের বিশেষ পরিচয় করেকটি প্রাচীন কুণ্ডে পাওয়া যায়। রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড, আকাশ গঙ্গা বা গুণ্ডগঙ্গা—এগুলি অতি আশ্চর্য্য, এই সকল কুণ্ড পাহাড়ের উপরে সংস্থাপিত। আমরা কাস্তন মাসে গিয়াছিলাম, তখনও জল রহিয়াছে দেখিলাম। এখানে অনেকে তীর্থ করিতে আসেন। পাহাড়ের এই খণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে একটি জৈন-মন্দির ও তৎ-নিম্নে একটি জৈন-অতিথিালা নির্মিত হইয়াছে। এই জৈন

মন্দিরটা প্রায় ৫০০ বৎসর নির্মিত হইয়াছে, শুনিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট এত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। জৈন-মন্দিরে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির সকলের স্তায় চরণযুগল রহিয়াছে দেখিলাম; কিন্তু এখানে এখন আর পূজা হয় না। মন্দির ও অতিথিশালা একেবারে শূন্য—এখন চৰ্মচটিকার আবাসে পরিণত। জৈন-মন্দিরের প্রাক্ষণে ঠাঁড়াইয়া পশ্চিমের দৃশ্য কণ কাল দেখিলাম। পাহাড়ের এই খণ্ডের চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গল, জঙ্গলের পর প্রান্তর ধুধু করিতেছে—গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িল না। স্বৰ্ঘ্য তখন আমাদেরগকেও এই অতুল কীর্তিরাজিকে আঁধারে ডুবাইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশে নিঃকলঙ্ক দ্বিতীয়ার চাঁদ মুছ মুছ হাসিয়া আমাদেরগকে একটু সাহসনা দিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা কণকাল অতিথি-শালায় বিশ্রাম করিয়া খণ্ডগিরির নিকট বিদায় লইলাম। এই অপূৰ্ণ কীর্তিরামি দেখিয়া যে আনন্দ পাইলাম, তার বিনিময়ে, হৃৎসীর সম্বল কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু সেই জনপ্রাণীশূন্য পাহাড়ে ফেলিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। কোথায় সেই বৌদ্ধ বোগীগণ, কোথায় সেই প্রাচীন নিকাম ধর্ম সাধন, কোথায় অশোক, কোথায় বা বুদ্ধ—ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভারতে এক সময়ে যদি এত জমাট ধর্মভাব ছিল, সাধকদিগের প্রতি রাজগ্যবর্গের এত অমুগ্রহ ছিল, তবে সে অমুগ্রহ আজ কোথায়? হায় ধর্মের স্থানে এখন ব্যভিচারের পরাক্রম, যোগতপস্তার স্থানে এখন পেচকের নৃত্য, নিকাম ব্রতের স্থলে এখন বাহু-চটক, গৌরব-লালসা বা আফালন! আমরা কতদূর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছি, পাহাড় হইতে নামিবার সময় একবার ভাবিলাম। এক সময়ে দারজিলিং, শিলং ও চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে ইংরাজের রাস্তা-নির্মাণের ও রেল-চালানোর কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, আর আজ প্রাচীন সময়ের এই প্রস্তর-নির্মিত কীর্তি দেখিয়া ইংরাজকে শত শত ধিকার দিলাম। যখন ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়ও হয় নাই বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না, হুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা কিরূপে এই অখণ্ড অভ্রভেদী পাহাড় খণ্ড সকলে এই সকল গুহা নির্মাণ করিল, ভাবিয়া বিশ্বয়ে পরিপূর্ণ হইলাম। সেই সকল অজ্ঞ কোথায়, বাহা দ্বারা এই কঠিন প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল? সেই সকল শিল্পীই বা কোথায় বাহাদের হস্ত এই চিরস্থায়ী হুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস পাহাড়ের গারে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে? এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারে না—কেহই উত্তর দিল না। ভয়প্রাণে খণ্ডগিরি

হীতে অবতরণ করিলাম। কত প্রস্তর খণ্ড উল্লেখন করিলাম, কিন্তু একবারও পদাঙ্কন হইল না। পাহাড়ের ছায়ায়, বৃক্ষের ছায়ায়, ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত পথ স্থানে স্থানে অলক্ষ্য ও অদৃশ্য হইয়াছিল, তবুও পড়িলাম না, তবুও মরিলাম না। বাঙ্গালীর শোণিত এই অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভে প্রোথিত হইলে, পাছে এ সকলে কলঙ্ক স্পর্শে, তাই এমন ঘটনা ঘটিল না। মানুষ হইলাম ত বাঙ্গালী হইলাম কেন? মানুষ হইলাম ত ভারতে জন্মিলাম কেন? মানুষ নামধারী হইলাম ত মনুষ্যত্ব পাইলাম না কেন, ধর্ম ও চরিত্রে বঞ্চিত রহিলাম কেন? ভাবিতে ভাবিতে শূন্য প্রাণে গাড়ীতে আসিলাম, আসিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। বহুর পথ্য অন্তঃকানের জল্প কপিলেশ্বর যাইতে হইবে, এজ্ঞ আর বিলম্ব করা হইল না। গাড়ীতে আসিয়া মৃতবৎ পড়িয়া বহিলাম—তখন বাক্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ভাবের স্রোত প্রাণকে উদ্বেলিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই রূপ অবস্থায় রাত্রি ৯ টায় ময় গাড়ী ভুবনেশ্বরের ডাক ঘরের সম্মুখে আসিয়া লাগিল।

কপিলেশ্বর ও ধউলি পর্বত ।

পুনঃ ভুবনেশ্বর—পুনঃ সেই পুণ্যতীর্থ, কীর্তির উজ্জল ক্ষেত্রে আসিয়া আবার নববল পাইলাম। নববলে বলীয়ান হইয়া সেই রাত্রীতেই কপিলেশ্বর দেখিতে চলিলাম। কপিলেশ্বর ভুবনেশ্বরের কিঞ্চিৎ নূন এক মাটল ব্যবধান। কপিলেশ্বর মন্দির ভুবনেশ্বরের অগ্রকরণে নির্মিত, কিন্তু এ মন্দির অপেক্ষাকৃত খুব আধুনিক।

পুরীর জায় ভুবনেশ্বরেও রথযাত্রা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ এক বৎসরের নির্মিত রথে বহুবর্ষ চলে, পুরী বা ভুবনেশ্বরের রথে সেরূপ চলে না। এই উভয় স্থানে প্রতি বৎসর নূতন জিনিসে নূতন রথ প্রস্তুত হয়। সে গগনস্পর্শী রথ সামান্য ব্যাপার নহে, তাহাতে প্রতি বৎসরে বহু অর্থ, বহু পরিশ্রম ব্যয় হইয়া থাকে। পুরীর রথযাত্রা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—এক মহাকাণ্ড। পুরীর রথের জায় বড় রথ বাঙ্গালার কোণাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভুবনেশ্বরের রথেও খুব ধুমধাম হয়, কিন্তু পুরীর রথযাত্রার সহিত তাহার তুলনা হয় না। এক সময়ে সর্ক বিষয়ে ভুবনে-

সরই উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ ছিল, কিন্তু কাল সহকারে শৈবধর্মের প্রকোপ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়—পুরী অথবা বিষ্ণু-ধাম, উড়িষ্যার এবং বলিলে অসম্ভব হয় না যে, ভারতের মধ্যে প্রধান তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের কীর্তি এখন বিশ্বতির অঙ্ক-কারের মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে। শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল যে, এখন আর এখানে পূর্বের জ্ঞান যাত্রী সমাগম হয় না বলিয়া পাণ্ডাদের দিনপাতেও দাক্ষণ কষ্ট হইতেছে। সামান্য দুটি একটা পরসার জন্ত তাহাদের কত কাকুতি মিনতি, কত অভ্যাস, কত অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন ! ভুবনেশ্বরের পূর্ব দক্ষিণ কোণে কপিলেশ্বর মন্দির সংস্থাপিত। কপিলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কপিলেশ্বর আধুনিক মন্দির, তত লোকজনক নাই। মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক ছোট। উড়িষ্যার দেবমন্দির সমূহ একই ছাঁচে, একই ভাবে নির্মিত। সাধারণতঃ মন্দির গুলি চারি অংশে বিভক্ত। শ্রীমন্দির বা গীঠস্থান, জগ-মোহন বা দর্শক মণ্ডলীর স্থান, নাটমন্দির বা নৃত্যাদির মন্দির এবং ভোগ-মন্দির বা ভোগ-উৎসর্গের ভবন। প্রধান মন্দির গুলির প্রাক্ষণ খুব বিস্তৃত, সহস্র সহস্র দর্শক সমাগমেও স্থানের অকুলান হয় না। উড়িষ্যার মন্দির সম্বন্ধীয় সাধারণ বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিব। সকল মন্দিরেরই বহিঃপ্রাক্ষণ প্রস্তরময়, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। প্রাক্ষণের পর প্রাচীর। মন্দির সমূহের প্রাক্ষণে প্রবেশ করিবার সময় জুতা সিংহদ্বারে রাখিয়া যাইতে হয়। কপিলেশ্বরে দুই শতের অধিক ঘর পাণ্ডা বসতি করেন। পাণ্ডাদের বসতি দেখিবার উপযুক্ত বটে। কামাখ্যার পাণ্ডাদের বসতি অপেক্ষা এখানকার বসতি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ। মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সারি সারি দীর্ঘ দীর্ঘ ঘর। সকল ঘর ত্রৈলোক্য, এক ঘর অস্ত্র ঘরের সহিত সংযুক্ত। উড়িষ্যার অনেক পল্লিতে আমরা এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ বসতি দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছি। মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ গিয়াছে, গাড়ী ঘোড়া সব যাইতে পারে, দুই পার্শ্বে সারি সারি ঘর। রাস্তার এক সীমায় তুলসী মণ্ডপ, ও পাড়ার দেবালয় বা সঙ্কীর্ণনের গৃহ। তুলসি মণ্ডপ আর প্রতি বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি দুঃখী, অতি দরিদ্র যে, সেও তুলসি-মণ্ডপ নির্মাণে কিছু না কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছে। কপিলেশ্বরের নিকটেই ভার্গবী নদী। মহানদী হইতে কৈয়াকই নদী বাহির

হইরাছে। কৈরাকই আবার দয়া ও ভার্গবীতে বিভক্ত হইয়া চিহ্না হুদে পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদী ধউলি পর্বতের নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কপিলেশ্বরে বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত কিছুই নাই, কপিলেশ্বর ভুবনেশ্বরের দ্বারার নিখিত—অথবা ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ মাত্র; সবই আছে—অথচ ভুবনেশ্বরের সহিত কিছুই তুলনা চলে না। কপিলেশ্বরের মন্দিরের ধারেই একটা ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, তাহার নাম মণিকর্ণিকা। ভুবনেশ্বর এবং কপিলেশ্বর, উভয় স্থানে বহু দোকানাদি আছে। দোকানের মধ্যে পান-সুপারীর দোকান সর্বত্রই জাঁকাল। শুনিয়াছি, উড়িষ্যার পূর্বে বাকুই ছিল না, বঙ্গ প্রদেশ হইতে বাকুই যাইয়া পানের চাষ করে। এখন পান-চর্ষণের জন্য উড়িষ্যা বিখ্যাত; অতি দরিদ্র ব্যক্তিগণও প্রতিদিন এক পরসার পানের কম চলে না। উড়িষ্যাবাসী ধনী দরিদ্র সকলের হাতেই তাষুনের থলিয়া থাকে। কপিলেশ্বরের দোকান সমূহ অহুসন্ধান করিয়া নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের পুরীষময় কিছু সাগুদানা পীড়িত বহুদূর অন্ত সংগ্রহ করিয়া লইলাম। সংক্ষেপে কপিলেশ্বর দেখিয়া রাত্রেই ভুবনেশ্বর কিরী-লাম। ভুবনেশ্বরে এক দিন ছিলাম বটে, কিন্তু তেমন দিন জীবনে অতি অল্পই জুটিয়াছে। ভুবনেশ্বর আমার প্রাণে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

শেষ রাত্রে আবার গাড়ী চলিল। ধউলি পর্বত অতিমুখে যাত্রা করি-লাম। পথ নাই, কোথাও নদীগর্ভ, কোথাও কবিত ক্বেত্র, কোথাও বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। সে যে কি কষ্ট, বাহারী কখনও গরুর গাড়ীতে এজনে ভ্রমণ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাষ্ট বুঝিতে পারিবেন। প্রাতে আমাদের গাড়ী ধউলি গ্রামের নিকট পৌছিল। আমাদের সন্দের পথপ্রদর্শক বহু উত্তরাশাসনে পর্বত প্রদর্শন করিবার জন্য এক জন শিক্ষককে ডাকিতে গেলেন, ইত্যবসরে আমরা সেই অপরিচিত ক্ষেত্রে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে দূর্য্য উঠিল। বেলা ছই ঘণ্টার সময় এক জন শিক্ষক সমভিব্যাহারে পরিদর্শক বহু উপ-স্থিত হইলেন। পীড়িত বহুকে লইয়া পুরীর রাত্তার দিকে গাড়ী চালাইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিয়া আমরা ধউলি পর্বতের দিকে প্রহুদ চিত্তে চলিলাম। আমরা পর্বতের পশ্চিম সীমা ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। পর্বতের পশ্চিম পাদপ্রান্তে একটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহাতে সিদ্ধিদাতা

গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, আর আমরা পৰ্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই সুরঙ্গের নিকট পৌছিলাম। দেখিলাম, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ছই তিন জন লোক পাশাপাশী হইয়া অনায়াসে এই স্ফুট দিয়া গমন করিতে পারে। ক্রমে নিম্ন হইয়া, সেই অখণ্ড প্রস্তর রাশি ভেদ করিয়া স্ফুট খণ্ডগিরির দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে ভুবনেশ্বরের গগনস্পর্শী মন্দির-চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। খণ্ডগিরিও দেখা যায়, কিন্তু কিছু অস্পষ্ট। শুনিলাম, খণ্ডগিরি ৫ মাইলের কিছু অধিক ব্যবধান হইবে। স্ফুট দেখিয়া অবশেষে ধউলি পৰ্ব্বতের পূর্ব দিকে চাহিয়া দেখিলাম। ধউলি পৰ্ব্বতের পূর্বে কোশল্যাগাঙ্গ। কোশল্যাগাঙ্গ সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য জনশ্রুতি উড়িয়ায় প্রচারিত আছে। শুনিলাম, এই পুকুরটীর দীর্ঘ ৩ মাইলের উপর হইবে এবং প্রস্থ এক মাইলের কিঞ্চিদধিক হইবে। কি অপূর্ব্ব কীর্তি!

এখন দীর্ঘটীর অধিকাংশ স্থানই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা শস্ত উৎপন্ন হয়। মধ্যবর্তী কতক স্থানে যে জল আছে, তাহাতে মনোহর পদ্মবন শোভা পাইতেছে। এই পুকুর সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই, কত্থা সহবাসে কোন রাজার একটী সন্তান জন্মে। একথাটী অন্তঃপুর মধ্যে প্রকাশ হইলে, রাণী ক্রোধে অধীরা হইলেন। অবশেষে রাজার প্রতি 'কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থা হইল, সন্তান ক্রোধে লইয়া কত্থা যতদূর গমন করিতে পারিবে, ততদূর ব্যাপিয়া একটী পুকুর কাটিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই ঘটনা হইতে ইহার উৎপত্তি। উপযুক্ত পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! কোশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস শুনিয়া পশুসম মানব-রিপুকে শত ধিকার দিলাম। কোশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস কটকেই শুনিয়াছিলাম, ধউলি পৰ্ব্বতের উপরে সেই স্ফুট পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তরাশাসনের সেই শিক্ষকের নিকট পুনঃ সবিশেষ বিবরণ শুনিলাম। কোশল্যাগাঙ্গের পশ্চিমে ধউলি পৰ্ব্বত, তার পশ্চিমে নদী, উত্তরতটে উত্তরাশাসন গ্রাম, পূর্বে পূর্ব্বশাসন গ্রাম, তৎপর পুরীর রাস্তা, দক্ষিণে দক্ষিণাশাসন। কোশল্যাগাঙ্গ খননের পর সেই রাজকুলাঙ্গার নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার তটপ্রায়ে বহু ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইরূপ জঘন্স্র পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখিয়া অবশ্য-একটু সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু

বর্তমান সময়ের চরিত্রহীনতার কথা ভাবিয়া প্রাণে বড়ই বাথা পাইলাম । এমন কোন্ পাপ আছে, যাব জন্ম হিন্দু সমাজে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? যে নকল কার্যের জন্ম লোকেবা প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়, মচরাচব শুনি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি পাপকার্য্য নয় । মদ্যপান, বাতিচার—সতীত্ব নাশ—এ সকল পাপ করিলে এখন আর সমাজে দণ্ড নাই, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতি সম্বন্ধ করিতে হয় না ! পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ কোন্ স্বর্ণ হইতে কোন্ নবকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অনুকূল ভাবিগাম এবং স্ত্রীদেবী হীৰু ভৎসনায় বিবিক্ত হইয়া যত্নাক্রমে কমেবল অশোকের অপমান কীৰ্ত্তি অথথানায় নিকট উপস্থিত হইলাম । দুই হইতে শতাব্দীর নামক কদম্বিকাবলী দেখিয়া মইলাম, কিন্তু সেখানে আর যাওয়া হয় না : অথথানায় এক অগুপ্ত কীৰ্ত্তি । সে বিরাটমূর্ত্তি পৰ্ব্বতের পাদে খোদিত, কিন্তু এখন কিছু ভগ্নদশাগ্রস্ত । তাহার নিম্নেই পবিত্র ভগ্নদেব অশোকের সময়ে পক্ষাঘাত প্রাপ্ত অশোকের নামদশটি অনুশাসন লিখিত বহিয়াছে, অক্ষয় পুনি পক্ষাঘাতের অতি ক্ষয়প্রাপ্তানে খোদিত হইয়াছে—বেশ পরিণাম বহিয়াছে, একটুকু অক্ষয়িত্ব হয় নাই—কখনও সে হইবে, তাহাও বোধ হইল না । পট্টাব সাহেব বলেন, অশোক রাজত্বের দশম ও দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে খুঁড়িল অনুশাসন (Donali inscriptions) খোদিত, অর্থাৎ ২২০ খৃঃ পূর্বাব্দে । অনুশাসন, সেই অনুশাসনে অশোকের নামদশটি ধর্ম্মোপদেশ লিখিত বহিয়াছে । অশোক শাসন দেখিয়া মনের মধ্যে কত কথা জাগিল ; কিন্তু সে কথা লিখিতে আর উচ্চা নাই । অশোক অনুশাসন দমন করিয়া মধ্যস্থ যেন পবিত্র হইল । সেই প্রাচীন স্মৃতিময় কাহিনীর সংস্পর্শে অধিকাল থাকিয়া যেন নবজীবন পাইলাম । ক্ষুধা তৃষ্ণা তখন ভুলিয়া গিয়াছি—সংসার মমতা তখন দিস্কৃত হইয়াছি । জীবনের সে দিন আর কি কখনও পাইব !

এই সকল দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ১১টা বাজিল, দ্রুত হইয়া কোশল্যাগারের শুষ্ক পৃথ গভীরক্ষেত্রে ভিতর দিয়া পূর্বদিক দিকে গাড়ী ধরিতে ছুটিলাম । চতুর্দিকের সেই প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ দৃশ্যবাস্তি যেন যন্ত্রের জ্বাৰ চক্রের সমক্ষে ভাসিতে লাগিল । মস্তক চিন্তায় এবং শরীর মধ্যে অবসন্ন—এই অবস্থায় পুরীর প্রশস্ত এবং অতি সুলভ রাস্তার উঠিলাম । গাড়ী আরও কিছু দূরে ছিল । আরও কিছু ছাড়িতে হইল । গাড়ীতে উঠিবাব সময় পৌড়িত বন্ধন পথ্য, সেই পূর্ব রজনীর অতি কষ্টে সংগৃহীত

সাত, সন্দের পরিদর্শক-বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে ভুল হইল। সেই বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি গাড়ীতে উঠিলাম। উত্তপ্ত রাস্তার উত্তপ্ত গুলিরাশি উড়াইয়া গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। কোথায় যাইব, কি খাইব, পীড়িত বন্ধুর পথ্য কোথায় পাইব, ভাবিয়া কিছুই ঠিক পাইলাম না। বিধাতার রূপা-ভাণ্ডারে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে ?

পুরীর রাস্তা ও পিপ্লী চটী ।

সেই উত্তপ্ত ধূলিময় রাস্তা দিয়া, কান্ধন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথায় কবিয়া গাড়ী ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পূর্কদিনের অর্দ্ধাহার বা অনাহার, বাজের দাক্ষণ পথ কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ—এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়া-রই কথা। এক গাড়ীতে দুই জন, একজন পীড়িত—গাড়ীর পার্শ্ব ১৮, ১৮ হাত বই নয়—তাতে শরীর অবসন্ন, তাতে আগুনকণা চতুর্দিকে, তায় ধূলিরাশি গাড়ীর চতুর্দিকে সদাই উড়িতেছে—কষ্টের আর সীমা নাই। কিন্তু এই বিষম কষ্টের মধ্যেও সুখ পাইলাম। পুরীর প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ এক অলৌকিক কীর্তি-স্তম্ভ। গুলিলাম, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে এই প্রকাণ্ড পথ নিশ্চিত হইয়াছিল। আসামের ট্রঙ্ক বোড দেখিয়াছি, পরেশনাথ পাহাড় ও বগডরের নীচ দিয়া ভাবতের যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত ট্রঙ্ক রোড (Great trunk road) গিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু তুলনায় পুরীর রাস্তাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। গুলিলাম, জনৈক ইংবাজ ভ্রমণকারী এই রাস্তাটাকে ভারতের একটা আশ্চর্য্য কীর্তি-স্তম্ভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রাস্তা নিম্ন ভূমি হইতে অনেক উচ্চ। রাস্তার দুই পার্শ্বে নানা বৃক্ষ সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কাঞ্চিনী নীরবে ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন স্থানের বৃক্ষগুলি আধুনিক। এই সুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর, বালেশ্বর হইতে কটক, এবং কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং রাস্তাটা বহুবৎ বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে যে সকল বড় বড় নদী পড়িয়াছে, সে সকল নৌকায পার হইতে হয়, তদ্ভিন্ন ছোট ছোট নদী উপর বিস্তর প্রস্তর নিশ্চিত পুল বিদ্যমান। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটা অপেক্ষা কৃত বড় নদী পড়িয়াছে, কিন্তু সে নদী শীতকালে জল-শূন্য, শুধু বাসুমণ, গরম গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। বর্ষাকালে নৌকা

গাড়ী পার হয়। এই রাস্তার মধ্যে যে সকল পুল আছে, সেই সকলের প্রত্যেক পুলেই স্মারক-লিপি ছিল, কিন্তু ইংরাজ বাহাদুর যে সকল স্মারক-লিপি অন্তর্হিত করিয়া আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতেছেন। পুরীর রাস্তা প্রস্তর-নির্মিত। পাহাড় হইতে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিয়া রাস্তার উপরই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, দেখিলাম। সে প্রস্তর অপেক্ষাকৃত কোমল, জৈবৎ লালবর্ণ, যেন না-মাটি না পাথর। পূর্বী বাস্তায় যত যাত্রীব ভিড় হয়, এত আর ভারতের কোন বাস্তায় হয় কি না, সন্দেহ। অসংখ্য লোক, অসংখ্য মালের গাড়ী, যাত্রীব গাড়ী অনববর্তী চলিতেছে। দৌল ও রথ যাত্রার সময়ের ত কথাই নাই। তখন সময়ে সময়ে বাস্তায় লোক ঠেলিয়া চলা ছুঁব হইয়া উঠে। এই প্রকাণ্ড বাস্তাব স্থানে স্থানে যাত্রী নিবাস বা চট্টা আছে। চট্টাতে পড়ের ঘর, পাঠকুঠা, কোথাও ভূট্টা একটা পুকুর, কোথাও নদী, যাত্রীদিগের ক্রান্তি দূর করিবার জন্ত বিদ্যমান আছে। ইংরাজ বাহাদুর অনেক চট্টাতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্ত পায়খানা প্রস্তুত করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছেন। পূর্বে স্ত্রী পুরুষ অবিভেদে এক মাঠে, পাশাপাশি হইয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিত। চান্দবানীতে একপ দৃষ্ট এখনও দেখা যায়—আমবা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। চান্দবানী ভদ্রকেশ্ব অধীন, এইটী জাহাজ হইতে অবতরণের স্থান—এখানে পায়খানার বন্দোবস্ত হইয়া নিত্য প্রয়োজন। গবর্ণমেন্ট যে সকল পায়খানা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একদিকে পুরুষ ও একদিক স্ত্রী-লোকের জন্য নির্দিষ্ট, ঠিক যেন রেলওয়ে স্টেশনের বন্দোবস্ত। বড় বড় চট্টাতে বড় বড় পায়খানা। কিন্তু এই পায়খানার ধারাই—স্থানে স্থানে অসংখ্য মল মূত্রের দোষ। পুরীর পথে যখন বসন্ত বা ওলাউঠার পুন পড়ে, তখন সংকট করিবার লোক থাকে না। রাস্তার ধারে মৃত, অক্লান্ত লোকদিগকে ফেলিয়া যাত্রীরা পলায়ন কবে। সে অতি ভীষণ দৃষ্ট। আমবা স্থানে স্থানে এই রূপ রাশি রাশি নর-কঙ্কাল দেখিয়া অনেক বার অশ্রুপাত করিয়াছি, এবং ভাবিয়াছি, যে তীর্থের জন্ত এত আয়োজন—সেই তীর্থের পথে চিকিৎসালয়ের কোন বন্দোবস্ত হিন্দু রাজারা কেন করেন নাই? আমাদেব দেশের দানের ব্যবস্থা অল্পরূপ। যে পথে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে পথে ঔষধের কোন বন্দোবস্ত নাই, দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ বাগা পাউনাম। কত ধনী ব্যক্তি এই ভারতে বিদ্যমান, কিন্তু কেহই ইহার সুব্যবস্থা করিতেছেন

না ; এ ছুঃখ আর রাখিবার ঠাই নাই । এখন হুই একটী স্থানে গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয় প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প এ তাহার বন্দোবস্ত এত সামান্য যে, দান্তব-সাগরের উপর দিয়া যখন প্রায় পরাক্রমে মহামারির ঢেউ চলে, তখন কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারা না। ষা'ক। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সুন্দর রাস্তার শেষে দেখিতে দেখিতে, শারীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল । গাড়ী চলিতে চলিতে বেলা আনুমানিক হুই ঘটিকার সময় পিপ্লীতে পৌছিল । পিপ্লী এক প্রকাণ্ড চটী, এখানে দাতব্য-চিকিৎসালয়, ডাকঘর, থানা, রেজেন্সীদে আফিস, পুকুর, বাগান ও বহু দোকান পসারী আছে । এটী যেন একা ছোট সহরের মত । মধ্যদিয়া পুরীর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, হুই ধানসারি ২ অসংখ্য ঘরবাড়ী । পুরীর সকল চটীতেই বাজার আছে, কিন্তু এখানকার বাজারটী কিছু বড় । বাজারে চিড়া, গুড়, চাউল, ডাইল, তৈল লবণ, কাষ্ঠ, এবং সর্বস্তানেই প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায় । পিপ্লীতে পৌছিয়াই এক আশ্চর্য্য বাপার দেখিলাম । পথে ভাবিতে-ছিলাম, পীড়িত বন্ধুকে কি পথ্য দিব, পিপ্লীতে পৌছিয়াই দেখি, গাড়ীর নিকট গরম ছুঃক লইয়া হুই তিনটী রন্ধা স্ত্রীলোক দাড়াইয়া । এ এক অপকৃপ বাপার । পুরী হুইতে ফিরিবাদ সময় এই স্থানে কত চেষ্টা করিয়াছি, ছুঃক পাই নাই । কিন্তু আজ দারুণ অভাবের দিনে, বিধাতা অসহায়দিগের জন্য যেন এই মহা আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ! দেখিয়া অবাক হইলাম, চক্ষু হুইতে জল পড়িল । বিধাতার এই অবাচিত দান, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, বন্ধুকে কতক পান করিতে দিলাম, কতক রাখিয়া দিলাম, আমিও কিছু পান করিলাম এবং ভাবিলাম, এই জন্য বন্ধু বা পথ্য কপিমাথের মাগু আনা ঘটে নাই । কতক অণ পর দেখিলাম, সেখানে মংগুও উপস্থিত । বন্ধুকে কতক স্নেহ করিয়া স্নান করিলাম এবং গায়েচান ভায়ার যত্নে কিছু অন্নভাব করিলাম । এই পিপ্লীতে বন্ধু কয়েকবার দাড়াইয়া । তাহারেই যেন দারুণ জ্বর পলায়ন করিতে লাগিল । ওষধ পদার্থান নব কঙ্কালপূর্ণ সেই রাস্তায়, বিধাতা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যেন আপনি অবতীর্ণ হইলেন । বন্ধু আরো অনেকবার জ্বর হুইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন বারই এত অল্প ছাড়ে নাই । বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া মোহিত হইলাম । দেহের ও মনের ক্লান্তি এই পিপ্লী চটীর বাজারে দেখিয়া বেলা ৫ টার সময় অবসর

গাড়ীতে উঠিলাম। পিপ্লী-চটা বহুদূর বিস্তৃত—অর্থাৎ এই রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত পিপ্লীর সজ্জিত গৃহবাতি পরিশোভিত। পিপ্লীতে অনেক নারিকেল গাছ আছে, দেখিলাম। এই স্থান হইতে নারিকেল গাছ আরম্ভ। পুরী জেলায় নারিকেল গাছের যেকোন আম্রাদানী, উড়িয়ায় আব কোথাও তেমন নাই। পুরী জেলা সমস্তই ভাবে আশ্রিত, সুতরাং লবণাক্ত, এই জন্যই বৃক্ষ নারিকেলের কিছু অধিক শুষ্ক। গুব্বা বা দিয়া গাড়ী ক্রমাগত চলিতে লাগিল। পথে স্থানে স্থানে দল্লার ভয়, কিন্তু গাড়ীতে যে বিপদ, দস্যুর ভয় করিবার অবসর ছিল না—সে বিষয় ভাবিবামাত্র সময় ছিল না। গাড়ী ক্রমাগত চলিল। রাত্রি ১০ ঘটিকাও সময় আ। একটা চট্টাতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া অল্প বিশ্রাম করা হইল; এবং কিয়ৎ কাল পরেই গাড়ী ছাড়া হইল। গরুর আগার খড় ও কুড়া (কুড়া) অথবা চুর্ণীকৃত ভুষ। এই কুড়া সকল চট্টাতেই প্রায় পাওয়া যায়। কুড়া ফলে মিশাইয়া দিলে তাহার মহাজ্ঞানে তাহা উন্নত হয়। ইচ্ছাতে অধিক সময়ও লাগে না, অথচ গরু খুব সবল ও স্বস্থ থাকে। সমস্ত রাবি গাড়ী চলিল। বেলা আট ঘটিকার সময় রাস্তায় বাটার ভিড় বাড়িল। বেলা দুটি সাঁত্রে ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, আমরা পূর্বের নিকটবর্তী হইয়াছি। ঘনজন্যের আনন্দ, উৎসাহ দেখিয়া মোহিত হইলাম, আপনাদিগের সহযোগী ন্যাক শত শত বাব বিক্রয় দিলাম। ভগ্নপ্রাপ্ত মন্দির দেখিয়াই যেন মনে পড়েছে—এই আশায় তাহার সকল কষ্ট ভুলিয়া ভীষণবেগে চলিতে লাগিয়াছে। কেহ ডিরবন্ধ জড়াইয়া আসেব বক্ত নিবারণ করিতেছে, কেহ মনে মনে বয়ে দেয় তেজ নিবারণ করিতেছে—পথকেই শব্দে ভরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহাদের মন প্রশান্ত। এমন স্থান হইল—যেখানেও লোকজন লাভ হয়। আমরা ভীষনে আব কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। ভীষনে যেন এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া দত্ত হইল। ক্রমে ভগ্নপ্রাপ্ত মন্দিরের সামনের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। সর্পিাক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিশান ধর্ম্মে বসে দিলে দিলে দিলে যেন যাত্রীদেরকে কত আশার কথা বলিয়া উচিত হইবে। যখন মন্দিরের নিশান ও শ্বেত চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল, তখন চমকিত হইতে লাগিলো “ভয় ভয়-মাগ” শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার, সে যে কি উৎসাহের সংবাদ, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। আমরা ব্যক্তিগতভাবে মুহুর্তে দম্পত্যবৈবাহিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে। সেই দিনেই আমাদের অগ্রসর

হইলার। জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশধারী পাণ্ডায়ে
ঘাতাত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টি-
গোচর হইতে লাগিল। এই রূপ মহা মুখ উপভোগ করিতে করিতে, গাড়ী
বেলা ৯ টার সময় আঠার-নালায় নিকট পৌছিল। লোকে বলে এবং হণ্টার
সাহেবের পুস্তকে লেখা আঠার; কিন্তু ছুটি রাখাল বালকের কথামুসারে
গণিয়া দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলানের পরিবর্তে ১৯টি খিলান
আছে। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্মিত। কখনও যে ধ্বংস হইবে,
মনে হয় না।

পুরীর বাহ্যিক অবস্থা।

এক মতে, আঠার নালা বাহাতে ১৯টি খিলান বিদ্যমান) মহারাজীয়া-
দের পূর্বে, (১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) মংসাকেশরী কর্তৃক
নির্মিত। পুরীর নীচ দিয়া ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইয়া চিঙ্গা অভিমুখে
গিয়াছে। আঠার নালা পুরীর সিংহদ্বার। এই ধানে উপস্থিত হইলে সাধকের
জীবন সার্থক হয়, ভ্রমণকারীর মনে এক অভূতপূর্ব চিন্তাপ্রোত উদিত হয়,
অধার্মিক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য হয়। পুরীর কথা আজীবন
ভাবা যায়, কিন্তু লেখা যায় অতি অল্প।

পুরীর পূর্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদী, উত্তরে পুরীর
রাস্তা। কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল, পুরী হইতে চিঙ্গা হ্রদ ২৮ মাইল এবং
কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। এই বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র ধর্ম্ম-ইতিহাসের উজ্জ্বল
ছবিতে পরিপূর্ণ। ভুবনেশ্বর, ধণ্ডগিরি, কপিলেশ্বর, ধউলি প্রভৃতি সমস্ত
এই ক্ষেত্রের মধ্যে। দুই সহস্র বৎসর যাবত উড়িয়া ধর্ম্মের পবিত্র লীলাভূমি
হইয়াছে। এই দুই সহস্র বৎসর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, ভাবিলে
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু ঝরে। এই দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, এক কথায় যাহারা ভারতের গৌরব বলি-
লেও অত্যাশ্রিত হয় না, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য,
নিত্যানন্দ, অচ্যুত, হরিদাস, রামানন্দ, জয়দেব, কবির, সকলেই এই ভূমি
স্পর্শ করিয়া ধ্বংস হইয়াছেন। এমন পুত্র ক্ষেত্র আর কোথায় মিলে ?

উড়িয়া সৌভাগ্যশালী, কেননা, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া কেশরী

বংশ, পদ্মাবংশ, সূর্য্যবংশ, ভূঁইবংশ, ঘাহারা উড়িষ্যার রাজ্য করিয়াছেন, তাহার। সকলেই ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। উড়িষ্যার ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস অসংখ্য অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পরিপূর্ণ। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম পঞ্চম শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মে পরিণত হয়, অর্থাৎ বৌদ্ধ রাজত্বের পর কেশরী বংশ ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির নির্মাণ করিয়া শৈব ধর্ম্মের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। শৈব ধর্ম্ম দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু ধর্ম্মে পরিণত হয়। গঙ্গাবংশাবতঃস অনন্তভীমদেব ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুমন্দির বা পুরীর শ্রীমন্দির নির্মাণ-কাৰ্য্য শেষ করেন। এই মন্দির সম্বন্ধীয় অসংখ্য কথা পরে বিবৃত করিব। ১১০৭—১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দাক্ষণ হুর্ভিক। উড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেন না, তাহা সাধারণের পক্ষে তত তৃপ্তিকর হইবে না।

পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩, জনসংখ্যা ২৫০০০, যাত্রীনিবাসের সংখ্যা ৫০০০। ইহার মধ্যে পুরীতে ৩৬০ মঠ আছে। মঠের ইতিহাস এইরূপ। পূর্বে যে সকল সাধক পুরীতে আগমন করিতেন, তাঁহাদের ভরণ্যোষণের জন্য তদানীন্তনের রাজত্ববর্গ বিপুল বিষয় সম্পত্তি দান করিতেন। মঠধারী ব্যক্তিগণ অবিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চা, এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি পরোপকার করিবেন, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিষয় দেওয়া হইত। বর্ত্তমান সময়ে মঠধারী ব্যক্তিগণ, সাধারণতঃ নাম মাত্র ধর্ম্ম চর্চ্চা ও অতিথি-সংকার করেন। এই সকল বৃত্তি-ধারী মঠের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। হুন্টার সাহেব বলেন, মঠ সমূহের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ পাউণ্ড। মহারাত্রীরদের সময়ে পুরীর মন্দিরে যাত্রীদের নিকট হইতে টেন্স আদায় হইত। এক পাউণ্ড ৯ সিলিং করিয়া প্রত্যেকের নিকট কর আদায় হইত, ইংরাজের। তাহা রহিত করেন।* ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লাট সাহেবের আদেশে মন্দিরের কর উঠিয়া যায়। পুরীর দেবোত্তরের আয়, হুন্টারের মতে, ১০১০০০ পাউণ্ড হইবে। পুরীতে প্রতিবৎসর ৫০০০০ হইতে ৩০০০০০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। মৃত্যু সংখ্যা বৎসর ১০০০০ হইতে ৫০০০০। ৩০০০ পাণ্ডা যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর নানা দেশে গমন করিয়া থাকে।

ইংরাজ শাসনে পুরী একটা জেলার পরিণত হইয়াছে; খোন্দা ইহার এক মাত্র সবডিভিসন। পুরীতে গবর্ণমেন্টের কাছারী, জেলখানা, ডাক্তার-

খানা, গবর্ণমেন্ট স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্তই আছে। কাছারী, ডাক বাঙ্গালা, সাহেবের বাড়ী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে সংস্থাপিত। পুরী সহর সমুদ্রের গর্ভে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। ৬০। ৭০ ফিট পর্য্যন্ত ভূমি খনন করিলেও বিশাল বিস্তৃত বালুরাশি দেখা যায়। কথিত আছে, নীলাচলে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ নীলাচল বালুময় অচল ভিন্ন আর কিছুই নয়। কথিত আছে, প্রথম যে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বালুরাশির গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। পুরীর পথ ঘাট সব সৈকতময়। কাছারীর চতুর্দিক যেন সৈকতময় মরুভূমি—তরঙ্গায়িত নেদের ছায় ছিন্ন ভিন্ন; বায়ু প্রকোপে নেব যেমন, সমুদ্রের তরঙ্গের প্রকোপে এই বালুরাশি তেমনই। যে রাস্তা দিয়া জগন্নাথ দেবের রথ গমন করে, সেটা অতি প্রশস্ত পথ। এই রাস্তাটা প্রায় এক মাইন দাপদান হইবে। এত বড় প্রশস্ত পথ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরেও নাই।

পুরীতে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রথম দৃশ্য বস্ত- সাগর। প্রধান কাজ- সেই অসহায় রমণী চতুষ্টির অনুসন্ধান। ধীরে ধীরে আমাদের শকট পোষ্টাফিসের সম্মুখে, আমাদের বন্ধু বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইল। তখন বেলা প্রায় ১১ টা বাজিয়াছে। বিজয় বাবুর বাগা বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, পোষ্টাফিসের সম্মুখে, সমুদ্রের অতি নিকটে। এত নিকটে, বোধ হইত যে, সমুদ্রের গভীরগঙ্জন নিস্তর রঙ্গনীতে যেন আমাদের শিরেরে জাগিয়া অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছে। পীড়িত বন্ধকে বিজয় বাবু বাসায় রাখিয়া আমি একটু ক্ষুধা পাইলাম। পূর্বে জানিতাম, বিজয় বাবু আড়ম্বরশূন্য লোক; তাঁহার ভালবাসা মখে ভাসিয়া বেড়ায় না— তাহা হৃদয়ের গভীরতম স্তরে মনো লুপ্ত। কিন্তু বিজয় বাবু আমা-দিগকে পাইয়া যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর আনন্দ বাহিরে প্রকাশ পাইবার নয়, কিন্তু এবার তাহা প্রকাশ পাইল। এত দ্রুতবেগে, বহুকাল পরে বন্ধু সন্মিলন, অগুরু সন্মিলন। আহবাস্তে বিজয় বাবু ও আমি সাগর তীরে গমন করিলাম, তখন অপরাহ্ন ২টা বাজিয়াছে। সূর্য্যের তীব্রতা সে সাগর তীরে নিস্তেজ; অনন্ত প্রবাহিত মৃত্ত বায়ু সূর্য্যের অতি প্রখর তেজকেও নন্দীভূত করিয়াছে। সাগরের ঠিক ধারে একটা টালিময় রাস্তা কাছারীর প্রাঙ্গণাদিও টালি দ্বারা আবৃত। এ বালি সমুদ্রকে আমাদের দেশের রাস্তার পাথর কুচি বা খোলা মছন করিতে পারে না।

সেই টালি দ্বারা নির্মিত স্তম্ভের ধারে, সাগরের ২০।৩০ হাত অনতিদূরে মধ্যে মধ্যে বসিবার জন্য বেঞ্চ আছে । আমরা একখানি বেঞ্চের উপর বসিলাম । সাগরের ধারে যে সকল বৃক্ষ দেখিলাম, সে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল বায়ুর আঘাতে উত্তরমুখী হইয়া হেলিয়া রহিয়াছে, প্রবল বায়ু-প্রবাহ বৃক্ষের পত্রগুলিকে যেন কাঁচি-ছাটা করিয়া দিয়াছে । সাগর তীর,—বহু মিলন—জীবনে কি আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন । এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই । যখনই তাবি, ইচ্ছা হয়, পুরীতে ছুটিয়া যাই । কত দূর হইতে বায়ু আসিতেছে, কত দূর হইতে সেই পৰ্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ আসিতেছে, কেহ জানে না । পুরীর সাগরের দক্ষিণে যত-যাও,—কেবল অনন্ত বারি রাশি—পৃথিবীর দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত শুধুই জলরাশি । উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত নীলসাগর—আকাশে ও জলে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে ; কোথায় আকাশের শেষ, কোথায় জলের শেষ, ঠিক বুঝা যায় না । দূর হইতে বোধ হয় যেন, আকাশের মেঘ জলে অবগাহন করিতেছে, জলের ঢেউ আকাশে চড়িয়া মেঘের আকাব ধরিতেছে । প্রকৃত ঘটনাও তাই । আকাশ সমুদ্রে ধায়, সমুদ্র আকাশে ধায় । বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সমুদ্র হইতে সকলের জন্ম । বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সব নদী নালা দিয়া সাগরে মিলিতেছে । এ এক দৃশ্য । কিন্তু এখানে, আকাশের মেঘ ও সাগরের ঢেউ যেন লোফা-লুফি করিতেছে, এক অপরকে আগ্রহন করিতেছে । কোন কোন তরঙ্গ পৰ্ব্বতাকাব ধারণ করিয়া ও মেঘ ধরিতে না পারিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া শেষে আশা দেয় পাদমূলে, সেই সৈকতময় প্রাচীরে আসিয়া ক্রোধ সঞ্চার করিতেছে । এত বাতাসই বা কেন, এত তরঙ্গই বা কেন ? এত উচ্চসই বা কেন ? শুনিয়াছি, লাগর ৫০ মাইলের অধিক গভীর নাই, পৰ্ব্বত ৩ মাইলের অধিক উচ্চ নাই । এত জল কোথা হইতে আসে যে, জোয়ারের সমস্ত সমস্ত তট প্রাবৃত করিয়া দেশ ডুবাইয়া যায় ? কোথা হইতে আসে, কোথায় যায় ; কেন হাসে, কেন নাচে, কেহ উত্তর দিতে পারে না । বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্বে রহস্ত উদ্বেগ করিতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক, এমন দার্শনিক পণ্ডিতের আজ্ঞাও আবির্ভাব হয় নাই । কেবল কল্পনা ও ‘থিওরি’ লইয়া বাহাদুরের বিদ্যার চরম দোড়, কি আত্মপূর্ণতা, তাহারা অনন্তের সীমা গণিতে ধায় !

পুরীর সাগর এ অগতে অতুল শোভার ভাণ্ডার । অগতে অনেক সাগর আছে, কিন্তু পুরীর সাগরের স্তায় বুঝিবা আর কোথাও সাগর এমন মিষ্ট নয়,

এমন গধুর ময় । মাস্ত্রাজে ঝড় হয়, স্নানরবন বজ্রা-প্লাবনে ডুবিয়া যায়, কিন্তু বহুকাল ধাহারা পুরীতে আছেন, তাঁহারাও এখানে ঝড় বজ্রার প্রবল প্রকোপ দেখেন নাই । গুনিলাম, একবার নাকি কেবল পুরী সাগর-জলে প্লাবিত হইয়াছিল । পুরীর সাগরের শোভা অতুল । এই জন্তই বৃষ্টি, কণারকের সূর্য্য মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে সাগরতীরে নির্মিত হইয়াছিল । পুরীর মন্দিরও বৃষ্টি বা এই জন্তই । অতুল শোভা দেখিয়া প্রাণের সাগরে ডুবিলাম । সসীমে অসীম—সীমায় অসীমা মিলিয়া পুরীতে যে অপূৰ্ণ জীবন্ত ভাগবত রচনা করিয়াছে, আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল । এই ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত মহান্ গেন প্রতিভাত হইলেন । নয়ন হইতে জল পড়িল । আমি আপনা হারাইলাম । বন্ধু বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বসিয়া আপনার বোধ হয় পীড়া হইয়াছে । বন্ধু বুলিলেন না, আমি কি হইয়া গিয়াছি ! বসিয়া, বসিয়া, বসিয়া—দিন কাটিল । মুখ কথা বলিল, প্রাণ তাতে সায় দিল না । দিন কাটিল, সূর্য্যও ডুবিল, সাগর আরো গাঢ়তর হইল । জীবনে অন্ততঃ এক দিন—এই দিন, আমাকে ভুলিয়া আমি অনন্তের অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছি । আমার লায় কেহ অনন্ত-পিপাসু থাক, ঐ পুরীর সাগর তীরে এক বার অন্বেষণ করিয়া এসো ।

পুরীর শ্রীমন্দির ।

সন্ধ্যাব সময়, বিজয় বাবু, পুরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লইয়া গেলেন । বাবু কাস্তিচন্দ্র মিত্র, পুরীর একজন সম্ভ্রান্ত উকীল । ইহাব বাসাতে প্রত্যহ অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয় । বন্ধুগণ সকলে, সেই সাগরতীরে, অতি দূর দেশে, যেন এক পরিবার-ভুক্ত—একের স্নেহ হৃৎথে যেন অপরের স্নেহ হৃৎথ । পোষ্ট মাষ্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, জে'লার বাবু নগেন্দ্র কুমার ঘোষ, ডাক্তার বাবু সাতকড়ি মিত্র, স্কুলের প্রধান 'শিক্ষক' বাবু শশধর রায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র আড়া, বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম । ইহারা সকলেই সদাশয়, মিষ্টভাবী, সহৃদয়, এবং সচ্চরিত্র । যেমন কটক, তেমনি পুরী । স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দূর দেশে সচ্চরিত্রতার জন্ত সকলের নিকট সম্মান পাইতেছেন দেখিয়া, প্রাণে যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম ।

সেই রাত্রেই সেই প্রলুপ্ত অসহায় রমণীদিগের কথা বন্ধুদিগের নিকট বলি-

লাম। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইলেন। পাণ্ডা বাবাজী হিন্দু পরিবারের জাতি ধর্ম বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, সকলেই আক্ষেপ করিলেন। অনেকেই পাণ্ডাদের হতুভিত্তাব হুই একটি উদাহরণ ব্যক্ত করিলেন। সকলেই প্রতিবিধানে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সন্মুখ্যতায় এমন জীবন্ত ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার সকলেই যেন একাত্মক। বিজয় বাবু সকলেবই জালবাসাব জিনিস। দেখিলাম, ভাবিলাম এবং আশ্চর্য্য হইলাম। পব দিন প্রাতে বম্বীদিগের অহুসন্ধানে বাহির হওয়া ঘাইবে, ধার্য্য হইল। বাত্রেই সংবাদাদি লইবেন, কোন কোন বন্ধু তার লইলেন।

পুরীর সাগর—সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রসবণ, পুঙ্কে ব্যক্ত করিয়াছি। পুরীর শ্রীমন্দির অলৌকিক ব্যাপার পবিপূরিত এক দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের সাগর। অনন্ত সাগরের তীরে এও এক অনন্ত সাগরবৎ অম্পম কীর্তি। শ্রীমন্দিরের সীমা আছে বটে, কিন্তু তাব রাজ্যে, জ্ঞান রাজ্যে, চিন্তা রাজ্যে ঠহা অসীম। সীমায় অসীম, সান্তে অনন্ত, পুরীর মন্দিবে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পুরীব জগন্নাথদেব, কথিত আছে, ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হন। অনেক দর্শন এবং অদর্শনের পন যযাতি কেশবীর দ্বারা ৪০৯ শকাবে জগন্নাথ দেব পুনঃ সংস্থাপিত হন। তার পর অনঙ্গ ভীমদেব ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনাক্রুত হইয়া বর্তমান পুরীব মন্দিব নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মাণে ১৪ বৎসর ব্যাপী সময় লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মাণ কাণ্ড শেষ হয়। প্রবাদ এই রূপ, তিনি আরো ৬০টা মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীদাক্ষক নামক পুস্তকে জগন্নাথ দেবের ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পৌরাণিক মত, উৎকল দেশীয় মত, বৌদ্ধ গ্রন্থের মত, দাঁতবংশের মত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত রূপে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

“জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতির সচিহ্ন কোন চিত্র দেবমূর্তির বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তূপের সচিহ্ন ইহাও বিশেষ রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ, এই তিনটা মূর্তি নির্মাণ কবিয়া কুন্তুমরাশি দ্বারা তাহা সজ্জিত করতঃ উপাসনা ও বন্দনা করিত। এতদু পুনঃসোওম্

ক্ষেত্রে ত্রিমূর্তি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্মকে জীৱরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। জী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়া হুই বৃগল রূপের পূজা করাই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। হিন্দুগণ সর্বত্রই বিষ্ণুর সহিত লক্ষী মূর্তি সংযোজিত করিয়া প্রকৃতি পুরুষের একত্র পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কৃত্রাপি এরূপদ্রুতাতা ভগিনীর একত্র পূজা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।” *

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহারা বিশেষ রূপ ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৈলাস বাবুর এই অপূর্ণ শ্রীদাক্ষত্রক গ্রন্থ খানি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এরূপ গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ বাদলা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের গঠন ও আকৃতি এবং পুরীর অস্তিত্ব সমস্ত বিশেষ ব্যাপার অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রবল পরাক্রম খর্ব করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত যাহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা জগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। শঙ্কর মঠ নামে পুরীতে একটা মঠ আছে। শঙ্করাচার্য্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই বৌদ্ধধর্মের বিরোধীগণের অগ্রণী। কিন্তু যাহাই হউক, বৌদ্ধধর্মের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও পুরীতে অব্যাহতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম—জগন্নাথদেব অদ্যাবধিও জগতে এই কথা, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম প্রচার দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন। জাতিভেদ প্রথা জগন্নাথক্ষেত্রে নাই—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সকলে একত্রে প্রসাদ উপভোগ করিলেও জাতি যায় না। ইহা বৌদ্ধধর্মের অক্ষয় দ্বিতীয় চিহ্ন। বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় চিহ্ন, পুরীর সৈকতময় বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুরুরিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নিম্নলিখিত উপদেশ যাহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরীতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন—জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম বৌদ্ধধর্মেরই পরিণতি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন।—

“ক্ষমাই এ জগতে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম।”

“স্বভাবই মনুষ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।”

“ক্রোধ ও হিংসাকে পরিভাগ কর।”

“কাহাকেও ছুঁরাঁকা হারা বিদ্ধ করিও না ।”

“অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ ।”

“দীন দুঃখী ও তৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর ।”

“নদীবক্ষে সেতু নির্মাণ করিয়া দেও ।”

“মহুযা পশু ইত্যাদির জন্ত পথ পার্শ্বে জলাশয় খনন কর ।”

“যজ্ঞার্থে কিম্বা উদর পরিভোষ জন্ত কখনও জীব হত্যা করিও না ।”

“পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না ।”

“পরদার করিও না ।”

“মিথ্যা কথা বলিও না ।”

“মাদক দ্রব্য সেবন করিও না ।”

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম, অহিংসা-প্রধান । ইহার উজ্জল প্রমাণ ;—কোশ-
ব্যাপী মন্দির-প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির সংস্থাপিত রহি-
য়াছে । শুনিয়াছি, পূর্বে এখানে বলিদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না ।
শাক্ত ধর্মের সহিত বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয় করিবার জন্ত যাজপুর (যজ্ঞপুর)
হইতে পার্শ্বাভী মূর্তি আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । মহাষ্টমীর দিন
জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, সেই সময়ে এখানে বলি প্রদান হইয়া থাকে ।
বস্তুতঃ পরবর্তী ব্যক্তিগণ যাহাই করুন, জগন্নাথ দেব যে অহিংসা প্রায়শঃ দেব-
মূর্তি বলিয়া পরিকল্পিত, ইহা সর্ববাদীসম্মত । কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যের
আগমনের পূর্বে এখানে ভোগের প্রথা ছিল না । এ কথা কত দূর প্রামাণিক,
বলিতে পারি না । আমাদের নিকট এ কথার সত্যতা কিছু অটল সন্দেহে
আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল ।

“স্থাপত্য-কার্য্যে পুরীর মন্দির অগতে অধিতীয়া,” বঙ্গবাসী এষ্ট কথা
ঘোষণা করিয়াছেন ।* আমরা এ কথা স্বীকার করি না । পারিস নগরের
একেল টাউয়ার প্রভৃতির কথা এখানে তুলিতে ইচ্ছা করি না । ভুবনেশ্বরের
মন্দিরের সহিত কারুকার্য্যে পুরীর শ্রীমন্দিরের কোন প্রকার তুলনা হইতে
পারে না । ষাঁহার উভয় মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার
করিবেন । তুলনায়, পুরীর মন্দিরকে কারুকাণ্ডহীন বলিলেও অধিক বলা
হয় না । এই শ্রীমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেক পরে নির্মিত হইয়াছে ।

কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ বলিয়া মনে হয়। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ ;—কলিকাতার মন্দিরমেন্ট অপেক্ষাও ইহা অনেক উচ্চ। কলিকাতার মন্দিরমেন্ট মাত্র ১১০ হাত উচ্চ। সাগরের প্রায় এক মাইল দূরে, প্রধান রাজপথের পশ্চিমে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দির দুই স্তর প্রাচীরে বেষ্টিত। পূর্বে কেবল এক স্তর মাত্র অল্প উচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্মাণের তিন শত বৎসর পরে পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয়ে উচ্চ প্রাচীর নিশ্চিত হয়। ইহার নাম, মেঘনাদ প্রাচীর। প্রাচীর প্রায় ২০২৫ ফুট উচ্চ হইবে। এই প্রাচীর থাকায়, বাহির হইতে মন্দিরের শ্রী-শোভা দেখা যায় না। প্রাচীরের বাহিরে সমুদ্রের তরঙ্গ-নির্বোধ শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ছাদের উপর না উঠিলে ভিতরে কিছুই শোনা যায় না।

বহিঃপ্রাচীরে ৪টা ফটক আছে। পূর্ব দিকের ফটকটা বড়ই জাঁকাল। এইটাই সিংহদ্বার, এ ফটকে নানাবিধ মূর্তি গঠিত দেখিতে পাইবে। চারিটা ফটকের চারি নাম। পূর্ব “সিংহদ্বার,” উত্তর “হস্তীদ্বার,” দক্ষিণ “অশ্বদ্বার,” পশ্চিম “খগ্নদ্বার,”। “সিংহদ্বারে” সিংহমূর্তি, “হস্তীদ্বারে,” হস্তিমূর্তি ও অশ্বদ্বারে “অশ্বমূর্তি” প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দ্বারে কোন মূর্তি নাই।

পূর্বদ্বারের সম্মুখেই “অকণন্তস্ত”। এই অতি মনোহর, অত্যশ্চর্য্য কারু-কাণ্যপূর্ণ স্তম্ভটী কণারকের উজ্জ্বল চিত্র, বহু টাকা ব্যয়ে এখানে আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অকণ-স্তম্ভের অঙ্গ যে কি অপরূপ কারুকার্য্যে ভূষিত, তাহা লিখিয়া বর্ণন করা দুঃসাধ্য।

বাহারা শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির স্বচক্ষে দেখিয়া ভ্রম সার্থক করিয়াছেন, তাহারাই বলিতে পারেন, মন্দিরের কি অপূর্ব রচনা-কৌশল। কেমন যে সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খলা বন্দোবস্তে পাকশালা, ভোগমন্দির, নৃত্যশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ; তাহা যে না দেখিয়াছে, সে তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে ?

অধিষ্ঠান-মন্দির, ভগমোহন, নাচ-মন্দির, ভোগ-মন্দির, রন্ধন শালা, নৃত্য-শালা প্রভৃতি লইয়া ক্রোশব্যাপী মন্দির ক্ষেত্র। বড় বড় মন্দিরগুলি প্রায় সমস্তই প্রস্তর নিশ্চিত। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ *—এত উচ্চে প্রকাণ্ড

* এই মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম নীলচক্র। ইহা অষ্টধাতু বাদ্যযন্ত্রিক সংযোগে অস্তিত হইয়াছে এবং দেখিতে অলৌকিক সুন্দর। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্রুপ্ত কালো গাহাড় এই চক্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এই পাপকাণ্ডে কৃতকাণ্ড হইতে পারে নাই, কেবল মাত্র কণকিং বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছিল ; বহুকালব্যধি এইরূপ বিকৃত অবস্থাতেই ছিল ; পরে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে

প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজ সন্নিহনে একথা জিজ্ঞাসা করেন। জনপ্রবাদ এইরূপ, এক ধান প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক একবার শ্রীমন্দিরের গাত্রে হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় নাই। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভবও বটে। শুনিলাম, মন্দির কতক দূর নির্মিত হইলে বালুকা দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হইত, তৎপরে বালুকা রাশির উপরে আবার নিম্মাণ-কার্য চলিত। এইরূপ করার সময়ে সময়ে মন্দির অদৃশ্য হইয়া যাইত এবং পরবর্তী লোকের চেষ্টায় আবার আবিষ্কৃত হইত। এ সকল কথা কত দূর সত্য, বলা যায় না। নিম্মাণ কোশল এত আশ্চর্য যে, বিপ্লবকার্য নির্মিত বলিয়া যে জনপ্রবাদ আছে, তাহা সাধারণ লোকে উড়াইয়া দিতে পারে না। অরুণ স্তম্ভের স্তায় কণারকের আরো অনেক কারুকার্যপূর্ণ প্রস্তরমূর্তি এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কারুকার্যে কণারকের সূর্য্যমন্দির অদ্বিতীয়। অন্ন মাত্র তাহার নমুনা যাহা ভোগমন্দিরের গাত্রে দেখিয়াছি, তাহাতেই মোহিত হইয়াছি। প্রস্তর খোদিত এক একটা মূর্তি ৩৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না। ভুবনে-খবেল মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে যেরূপ, পার্শ্বভী, গণপতি ও কান্তি-কেয়ের অপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তি সংলগ্ন রহিয়াছে, পূর্বীর শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎ তিন ধারের গাত্রে, সেইরূপ নৃসিংহ, বামন ও ককি অবতারের তিন গিরাট মূর্তি সংলগ্ন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্তি যাজপুর ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় কি না, সন্দেহ। এতদ্বিন্ন পূর্বীর শ্রীমন্দিরের তিন দিকের গাত্রেই অসংখ্য অশ্লীল ছবি অঙ্কিত ও খোদিত রহিয়াছে। ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা কন্যা, স্বামী স্ত্রী মিলিয়া সে সকল কদর্য ছবি দেখা যায় না। মাতৃবের চিত্তায়ও তাহা স্থান পাওয়া সম্ভবে না। স্ত্রী পুরুষের বিবিধ রূপ সম্মেলন জীবন্ত ছবি মন্দির গাত্রে দেদীপ্যমান*। এ সকল ছবির ইতিহাস কি, বুঝিতে পারিলাম না, কেহ

পুন্ডার প্রথম রাজা রামচন্দ্র দেব কর্তৃক উহার সংস্কার হয়। তাহার পর বিদ্যাসিংহ দেবের রাজত্ব সময় ইহার পুনঃ সংস্কার হয়। চন্দ্র ওতনে ৪ মন ৩০ সের ১০ চটাক ৩ কাঁচা। পরিধি ৭ ফিট লম্বা, প্রস্থ ৪ ইঞ্চি, পুরু দুই ইঞ্চি; এইবার উহার তৃতীয় সংস্কার। ইহাতে সর্বদরকমে ১৭০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

* আমরা পূর্বীর মন্দিরের কদর্য ছবির বর্ণনা করিয়াছি বলিয়া সহযোগী বঙ্গবাসী আমাদেরকে প্রকারান্তরে পালি দিয়াছেন। আমরা “বুর্খ”, “ততরা” পাণ্ডিত্যভিনয়ী” বঙ্গবাসীর সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক কবি আমাদের পক্ষে সাজে না।

ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। জগন্নাথ দেবের রথবিহারের জন্ত আর একটি মন্দির, ঠিক এই মন্দিরের অল্পদূরে, দূরে নির্মিত হইয়াছে। তাহার নাম গুণ্ডীচা বাড়ী। এই গুণ্ডীচা বাড়ীর মন্দিরের অঙ্গীল ছবি পরিদর্শন করিয়া আমাদের ভূতপূর্ব ছোট লাট বেলী সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে, ধর্মমূর্তির পরিবর্তে একরূপ কদম্ব ছবি সকল কেন অঙ্কিত হইয়াছে, বুঝা ভার। কেহ কেহ বলিলেন—এবং আমাদেরও বোধ হয়, এ সকল ছবি অনেক পরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তখনকার রুচি ইহাতে প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলিলেন, এই সকল দেখিয়াও যাহাদের মন বিচলিত হয় না, তাহারাই প্রকৃত জগন্নাথ-দর্শনের অধিকারী। সেক্ষেপ অধিকারী কয় জন আছেন, জানি না। সে সকল দেখিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করে না, সেখানে অতি অল্প লোক। তবে অবশ্য, “বঙ্গবাসীর” কথা আমরা বলিতে পারি না। সন্ধ্যার পর পুরীর শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। বাহিরে পাছকা রাখিয়া মন্দির-প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বহু লোক ভোগ বিক্রয় করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক ঘৃত দীপ সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে। আমরা নাটমন্দির হইয়া জগমোহনে (Hall of audience) গেলাম। মন্দির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) শ্রীমন্দির, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (৪) ভোগমন্দির। সেখানকার জনতা ভেদ করে, কার সাধ্য। সময়ে সময়ে সেখানে মানুষ পেষিত হইয়া যায়। দোল ও রথযাত্রার সময় জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সাহায্যে শান্তি রক্ষা করেন। আমরা অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম প্রসন্ন-নির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। মন্দির অন্ধকারময়, দিবসেও বাতি জালিতে হয়। উড়িষ্যার মন্দির সমূহের ছায়াতে আসামের মন্দির সমূহ নির্মিত। উভয় দেশেই মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময়। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের একটি মাত্র দ্বার—তাহার সম্মুখে জগমোহন, তার পর নাট্য মন্দির, তার পর ভোগমন্দির ইত্যাদি। সূর্যালোকের সাধ্য কি, সে সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে। অহরহ ঘূতের প্রদীপ জলিতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা মূর্তি দেখিলাম। পুরীর ভোগমন্দির লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ। এ এক অলৌকিক ব্যাপার। ৬০০০ লোক এই কাজে সমস্ত বৎসর নিযুক্ত থাকে। জগন্নাথের প্রসাদে বিশ সহস্র লোক সমস্ত বৎসর জীবন ধারণ করে। শ্রীক্ষেত্রে ২৪ টি উৎসব হয়, তন্মধ্যে দোল ও রথ যাত্রাতেই অধিক যাত্রীর

সমাগম হয়। এই উভয় উৎসবের মধ্যে রথযাত্রাতেই অধিকতর যাত্রী উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশের লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মহায়া “পেরিশ মহামেলাকে পৃথিবীর ছবি” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে আমরা, সেইরূপ, ভারতবর্ষের প্রতিকল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি। এ তীর্থের পবিত্র সংস্পর্শে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের অসংখ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একরূপ সম্প্রদায় নাই। পুরীর রথযাত্রা, এক অলৌকিক ব্যাপার। প্রতি বৎসর নূতন রথ প্রস্তুত হয়। রথ খানি ৪৫ ফিট উচ্চ হয়। ৪২০০ বৈতনভোগী লোকের সাহায্যে রথ গমন করে। স্তুতরাং কত কাষ্ঠের সাহায্যে যে তাহা নিশ্চিত, অনারাসেই অনুমান করা যাইতে পারে। গুনিলাম, রথনির্মাণের কাষ্ঠের মাত্র অনেক অরণ্য রক্ষিত রহিয়াছে।

পুরীতে যে ৫টি মহাতীর্থ আছে, তাহাদের নাম নরেন্দ্র, মাকণ্ড, খেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্বার ও চক্রতীর্থ। এতদ্বির পুরীর প্রধান ধর্মালয়—লোকনাথ, চৈতন্তের মঠ, স্বর্গদ্বার, শঙ্কর মঠ, ভোটাগোপীনাথ। এ সকল সম্বন্ধে অল্পাধিক পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলিব।

একটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রীক্ষেত্রে দেখা যায়। জগন্নাথের সেবার জন্য এক দল বেণ্ডা রক্ষিত আছে। বাঙ্গালার যেমন পুরোহিত শ্রেণী, পুরীতে জগন্নাথের বেণ্ডাশ্রেণী সেইরূপ সম্মানের জিনিস। রথ যাত্রার সময় মন্দিরের সম্মুখে ইহারা বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের ছায় বাদ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। ধর্মমন্দিরে বেণ্ডার একরূপ অধিকার আর কুহাপি দেখা যায় না। কেমন করিয়া এই প্রকার আবির্ভাব হইয়াছে, অনুমান করা কঠিন। বোধ হয়, ইন্দ্র সভার অনুকরণে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, এই বেণ্ডাশ্রেণী সমাজে বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা বহু লোকের ধর্ম বিনষ্ট হইতেছে। পুরীর প্রধান পাণ্ডাগণের দূষিত চরিত্রের কারণ যে ইহারা নহে, তাহাই বা কেমনে বলিব? পুরী—শ্রীক্ষেত্র, কিন্তু হিসাবান্তরে পুরী অধর্মের লীলাস্থল। পুরীতীর্থ হইতে চরিত্র ও কুলধর্ম বজায় রাখিয়া যে সকল যাত্রী আসিতে পারেন, তাহার নারী হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবতা। গুনিয়াছি, পুরী ব্যতিচার-দোষে প্রাবল্য। তীর্থ সমূহের এই রূপ কদর্যা কথা গুনিলে প্রাণে দাক্ষণ আঘাত লাগে। ভারতবর্ষের তীর্থগুলি এখন অধর্মের লীলাস্থল হইয়া ভারতের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে আমরা ৩৪৪টা বস্তু মিলিয়া সেই রমণীগণের অঙ্ক সন্ধানে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইরাছি, তাঁহার পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, স্মৃতরাং এখন আর মিথ্যা বলিলে চলিবে না। পূৰ্ব্ব রাজ্যে বাহাদুরের উপর সংবাদ লওয়ার তার ছিল, তাঁহার সংবাদ দিলেন যে, অগ্নিধ্বংসের মন্দিরের দক্ষিণে, কালীবাড়ীর নিকটে, বাজীনিবাসে তাঁহার আছেন। বাজীদিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্ গৃহে কোথা হইতে কে আসিয়া রহিয়াছে, পরিদর্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন। ভোগ পরিদর্শনের জন্ত, বাজী নিবাস পরিদর্শনের জন্ত, উৎসবের সময় মন্দির রক্ষার জন্ত বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-গণ, পালাক্রমে, পুলিশের সাহায্যে মন্দিরের শান্তি রক্ষা করেন। এ সকল বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়, যুব নামক যে একটা পদার্থ আছে, তাহার আকর্ষণের হাত এড়ান বড়ই কঠিন, স্মৃতরাং গবর্ণমেন্টের সুন্দর বন্দোবস্ত থাকি সত্ত্বেও পচা ভোগ বাজারে বিক্রয় হয়, বাজীনিবাসে ১০ জনের স্থানে ২০ জন স্থান পায়, ইত্যাদি। আমরা নির্দিষ্ট গৃহে গমন করিলাম। লোকেরা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? রমণী চক্ৰবর্তী তখন তীর্থ করিতে গিয়াছেন, অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম, তবুও সাক্ষাৎ হইল না। ইত্যবসরে আমরা কালীর মন্দির দর্শন করিয়া আসিলাম। আসিয়াও তাঁহাদিগকে পাইলাম না। প্রচণ্ড রোজের তেজ মাথার উপর চড়িল—রাতার বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তবুও তাঁহার তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। অগত্যা তদ্ব্যমানে আর দ্বিপ্রহরের সময় বাসার ফিরিয়া আসিলাম।

পুরীর তীর্থের কথা ।

পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম—নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, বেতগঙ্গা, ইন্দ্রহাঙ্গ এবং চক্র-তীর্থ। তারপর দিন প্রাতে শুভীচা বাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্দ্রহাঙ্গ ও দরসিংহমন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। শুনিলাম, রথ বিহারের সময় জগন্নাথদেব একদিন মাসিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্দ্রহাঙ্গের শ্রী শুভীচা দেবীর নামে শুভীচা বাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। শুভীচা বাড়ীর প্রাঙ্গণ পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু মন্দিরের

নানা বিভাগ ঠিক ঐশ্বর্যের অচরুপ । ভোগ প্রভৃতির গৃহগুলি ভিন্ন আর সমস্তই ইষ্টকমর । এই মন্দিরের গায়েও অসংখ্য অলীল ছবি বিদ্যমান আছে । প্রাতে বেথিলান, দলে দলে পাণ্ডা সমজিব্যাহারে বাজীগণ শুভীচা বাড়ী বেধিতে আসিতেছেন । বিধবার সংখ্যাই অধিক । অলীল ছবিগুলি পাণ্ডারা এইরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল ; “এই দেখ, এই খানে ভগবান এক সখীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন ।” এইরূপ কথা শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জার মুখ আবৃত করিতে লাগিল । কিন্তু পাণ্ডাদের ব্যাখ্যা তবুও ফুরায় না ! তাহাদের পরস্য লওয়ার কমি দেখিলে অবাক হইতে হয় । যেখানে লইয়া বাইতেছে, সেই খানেই বাজীগণকে “এই খানে কিছু চড়াও” বলিয়া পরস্য আদায় করিতেছে । পরস্য প্রদানের এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পরস্য করিয়া এতোক স্থানে দিলেও সমস্ত পুরী দেখিতে ৬।৭ টাকা লাগে । এতটুকু প্রধান পাণ্ডাদের প্রাণ্য—সে ত স্বতন্ত্র কথা । শুনিরাছি, কেহ কেহ পুরী হইতে ককীর হইয়া প্রত্যাগমন করেন । শুভীচা বাড়ী দেখিয়া নৃসিংহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । শুভীচা বাড়ী এবং ইন্দ্রছারের মধ্যে ইহা অবস্থিত । এখানকার বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি মূর্ত্তিকা নির্মিত বলিয়া বোধ হইল । কতি অবতারের মূর্ত্তি বিশেষ রূপ মনকে আকৃষ্ট করিল । তৎপর ইন্দ্রছার দর্শনে গেলাম । ইন্দ্রছার রাজার নামে এই পুন্ড্রের নামকরণ হইয়াছে । শুভরাত্রির বাজীগণ জলে বধন সুরকির মোওয়া তাসাইতে লাগিলেন, তখন জনৈক পাণ্ডা বিকট চীৎকার করিয়া নানারূপ সঘোষনে কূর্ষ-অবতারের বংশধরগণকে ডাকিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে কূর্ষগণ সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিল । আর তখন পাণ্ডা মন্ত্র পড়িতে লাগিল, “মৎস্ত, কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর জনার্দন ইত্যাদি” । বাজীগণ এই মন্ত্র পাড়াইয়া দেখিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন ।

নরেন্দ্র ।—একটা প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুন্ড্র, ইষ্টক দ্বারা তীর বাধা । তনা বার, ইহার মধ্যে কুস্তীর আছে । এই পুন্ড্রের মধ্যস্থলে একটা মন্দির আছে । বৈশাখ মাসে এখানে একটা মেলা হয়, তাহারকৈ চন্দন বাজা বলে । ২১ দিন মেলা থাকে । মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া থাকেন ।

মার্কণ্ড ।—এটা অপেক্ষাকৃত ছোট পুন্ড্র, এটিরও তীর বাধা, এটিও খুব প্রাচীন । এখানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীতে কালীর দশম বাজা হয় ।

ধ্বংসগঙ্গা।—এটা সর্সাপেক্ষা গভীর। অস্ত্রান্ত্র তীর্থের স্রাব এখানেও যাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন।

চক্রতীর্থ।—অথবা সমুদ্র। সমুদ্র দেখিলে যে নবজীবন লাভ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই; তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহান।

একদিনে এই পঞ্চতীর্থে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর একত্রে দূরে অবস্থিত যে, প্রাতঃকাল হইতে স্নান আরম্ভ করিলে সকল তীর্থ শেষ করিয়া আসিতে ১২টা বাজে।

সর্সাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ। লোকনাথকে ভয় করে না, এমন লোক পুরীতে বিরল। লোকনাথের মন্দির ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম। অন্ধকারময় গৃহে লিঙ্গরাজ বিরাজিত। এখানে শৈবধর্মের জাজ্বল্যমান নিদর্শন দেখিলাম। ছই চারি জন ভক্তের সহিত দেখা হইল। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধুমধাম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মাঘ, কার্তিক ও বৈশাখ মাসেও খুব ধুমধাম হয়।

তোটাগোপীনাথ।—একটা প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ এইরূপ, এই থানে চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্বান হয়। এসম্বন্ধে একটা কবিতা পাওয়া যায়; সেটি এই—

“কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সবে।

গোরাচাঁদে হারাইলু গোপীনাথের ঘরে।”

এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাকিতেন। এইরূপ কথিত আছে, এক দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না।

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গ-দুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, শঙ্কর, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্তী একটা প্রশস্ত স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকারাশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গদুয়ার বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহা দেখিয়া পয়সা দিয়া থাকে।

ইহারই একটু দক্ষিণে ভক্ত হরিদাসের সমাধি-মন্দির। বৈষ্ণব-ভক্তগণের নিকট ইহা একটা তীর্থ। সমুদ্রের উপকূলে ইহা সংস্থাপিত। যত দিন ভারতে বৈষ্ণবভক্তগণের অধিষ্ঠান, তত দিন ভক্তপ্রের্ত হরিদাসের নাম অক্ষয়।

পুরীর ত্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোট ছোট মন্দির আছে—তাহাতে বহু দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলার মন্দিরই প্রধান। এই বিমলা, যাজপুর অথবা বিরজা-ধাম হইতে আনীতা হইয়া-

ছেন। শাক্তধর্মের সহিত বৈষ্ণবধর্মের সম্মিলনের জন্ত এই রূপ বিধান করা হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে। বাহলা ভদ্রে তাহার উল্লেখ করিলাম না। শুনিলাম, এই বিমলা মন্দিরে, মহাষ্টমীর দিন জগন্নাথ দেব যখন নিদ্রিত হন, তখন মহাবলি হয়। পুরীতে বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষের একমাত্র চিহ্ন—জাতিভেদের অন্তর্দ্বান। শ্রীমন্দিরের মহাপ্রসাদ আত্রাক্ষণ চণ্ডাল একত্রে সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে। এই প্রথা প্রচলিত থাকার হিন্দুধর্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বিমলাকে এখানে আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। শাক্তধর্ম্মানুসারে প্রসাদ মন্ত্রপূত হয়, এই ধারণায় এখন আর ধর্ম্ম লোপ হইবে, এরূপ ভয়ের কারণ নাই। বিমলার মন্দিরের প্রাঙ্গণে রোহিণী-কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে ব্রহ্মার প্রথম সাক্ষী “ভূষণ্ডিব্রাহ্ম” পড়িয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলেন, প্রবাদ আছে।

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছি। বাহলাভদ্রে সে সকল বিবৃত করিলাম না। বচবার জগন্নাথ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, ১৫০ বৎসর অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, ৩ বার চিকাহুদে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মন্দির নির্মিত হয়; কোন মতে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীঅনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১২৫,০০০ লক্ষ স্বর্ণ মার (এক কোটি টাকা) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের মণি মুক্তা এই কার্যের জন্ত নির্ধারণ করিয়াছিলেন। চূড়া সমেত ইহা ১৯৮ ফিট উচ্চ।

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময়ে তিনটা রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা সেই তিনটা রথে আরোহণ করিয়া শুভ্রীচাঁদ গৃহে গমন করেন। এক সম্ভ্রাত্ত অশ্বত্থ তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। জগন্নাথের রথের নাম “নন্দীদেব,” ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, বলরামের রথ “ভালধ্বজ,” ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, সুভদ্রার রথের নাম “পদ্মধ্বজ” ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ।

মহাত্মা হন্টার সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানন্দ উৎকলে আগমন করেন। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবের আবির্ভাব। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাস; ১৪৩৩তে বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কবীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ হইতে চৈতন্তদেব, ১৫৭২তে গোবিন্দ দাস এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাসের পূর্ব লীলা বলিয়া অনুমান হয়। চৈতন্তদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অমরপ্রভা করেন। তিনি বহু বৎসর উড়িষ্যা থাকেন; ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ

পৰ্য্যন্ত চৈতন্তের উৎকল প্রচার; প্রতাপ রত্ন দেব এই সময়ে রাজা ছিলেন। ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দ বিষ্ণুপুরাণের সময়। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। এইরূপ প্রবাদ, ইহারা সকলেই পুরী আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্ত, কবীর, নানক ও শঙ্করাচার্য্য যে আসিয়াছিলেন, তথ্যবিষয়ে সন্দেহ নাই; কেননা, এই সকলের নামেই এক একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্মক্ষেত্র, অথবা ত্রীক্ষেত্র। গবর্ণমেন্টের প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্মব্যবসারীর প্রতাপ। বতাই পুরীর বিষয় অল্পসন্ধান করা যায়, ততই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বরাশিপূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান ভারতে দুর্লভ।

আর এক দিন বৈকালে সেই মেরে কয়েকটীর অল্পসন্ধানের বাহির হইলাম। কটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সঞ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একখানি বেনামা পত্রে লিখিয়াছিল যে, “এই কয়েকটা অসহায় মেয়েদিগের জন্ত আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।” সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া সে পত্র ছাপান নাই। ঐ ব্যক্তি সব-জাতা উপাধি পাওয়ার বোগ্য, কেননা, পুরীতে না বাইরাও লিখিতে সাহস পাইল, “আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।” বা’ক। অল্পসন্ধানের সেই কয়েকটা মেয়েকে পাওয়া গেল। তাহারা তখন এত দূর বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের কথা ও বাদ প্রতিবাদ শুনিয়া আমরা অবাক হইলাম। এদিকে দেখিলাম, অনেক বণ্ডমার্ক সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার পর বুঝিলাম, আমাদের দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন অগত্যা আমাদের পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমরা কোন খবর পাই নাই। তাহারা পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া না থাকিলে হুঃখের সীমা নাই। এইরূপ করিয়া কত নারী যে বিপথে পাকেনিতেছে, তাহিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

পুরীর প্রধান পণ্ডিত ত্রিযুক্ত দামোদর তীর্থ স্বামী এক জন প্রাচীন বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি। শঙ্করের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য। শুনিলাম, শ্রী মঠ পরিভ্রমণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। মঠধারী সন্ন্যাসীর মঠ পরিভ্রমণ—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী আরো সন্ন্যাসী হইবার জন্ত চলিয়াছেন—বাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও

হিঁড়িতেছেন ; এই জড়বাদের দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল । আমরা তাঁহার অলৌকিক জীবনের কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম । তার পর আমরা তাঁহার আদিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম ।

শঙ্করের মঠ—বালুকা-গুহার মধ্যে নির্মিত । সমুদ্রের উপকূলে অনন্ত বালুরাশি—তাঁহার মধ্যে একটা গর্ভের স্থান স্থানে এই মন্দির । মন্দিরের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদি আছে, অসংখ্য হস্তনির্মিত পুঁথি আছে । মন্দিরের কিঞ্চিৎ আর আছে, তদ্বারা শিষ্যবর্গের কোন রকম ভরণপোষণ হয় । শ্রীমুক্‌ নামোদয় তীর্থস্বামী শ্রীমন্দিরের মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন । তীর্থস্বামী সরল সংস্কৃত ভাষার কথা বলেন ; তিনি অতি মিষ্টভাবী ব্যক্তি । তাঁহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মুষ্টি দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করা যায় ; তিনি একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, অমৈতবাদী । তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিলাম । তিনি আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের এইরূপ মর্ম্মের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ।

১। এক অকিঞ্চিৎ দেবতা ভিন্ন জগতে দুই নাই । যত দিন মানুষ মোহের অধীন, ততদিনই বিশ্ব বোধ । মোহ ছিন্ন হইলে—অমৈতভাব প্রাণে উপস্থিত হয় ।

২। উপাসনা বা পূজা তত দিন, যত দিন মানুষ মোহের অধীন অথবা যত দিন মানুষের বিশ্ব বোধ আছে । বিশ্ব বোধ খুঁচিলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না । ইন্দ্রিয়-মূলক আদিষ্ট বোধ মানুষের সর্ব্বনাশের মূল ।

৩। “আমিই সেই”—অমৈতবাদীর এ মত নয়, “আমি নাই, কেবল “তিনি আছেন”—এই মত । আপনার নাশই প্রকৃত ধর্ম্ম ।

৪। মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার পক্ষে কর্ত্ত্ব কাণ্ড সহায় । শেষে কর্ত্ত্ব কাণ্ডের প্রয়োজন নাই ।

এই সকল কথা শুনি পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি পুরীর শ্রীমন্দিরের জগদ্বাচস্পদকে মানেন ?

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন—“না—আমি মানি না ।”

আমরা ।—তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে বান কেন ?

তিনি ।—লোকদিগকে দেখাইবার জন্য । আমি না বাইলে অনেকের অনিরাশ হইবে ।

আমরা।—বর্ষে কপটতা ভাল কি?

তিনি।—ভাল নয়, কিন্তু এরূপ না করিলে পৃথিবীতে ধর্ম যে আর থাকে না।

আমরা।—এই রূপে কি থাকিবে?

তিনি।—থাকিবে, একটা ~~অবস্থা~~ চাই। আশা করি, এইরূপ করিয়া সকলে এক দিন ঈশ্বরের নিকটে গৌহিতে পারিবে।

আমরা।—এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিরাছেন কি?

তিনি।—দেখি নাই বলিয়া হুঃখিত, সেই অল্প মাহুষের সংসর্গ আর ভাল লাগেনা, বাইতে পারিলে বাচি।

এই রূপ নানা কথার বুঝা গেল, তিনি বাহা বিশ্বাস করেন না, লোক দেখানের অল্প তাহাও করেন। তিনি সরলভাবে দুর্বলতা স্বীকার করিলেন; ইহাও বলিলেন, অগম্যধর্মনিরে হাইয়া তিনি পূজাদি করেন না। এই মহাত্মার সংস্পর্শে বতকণ ছিলাম, যেন স্বর্গে ছিলাম। যেমন ধর্মজ্ঞান, তেমন অমায়িকতা; যেমন বিশ্বাস, তেমন ভক্তি। অবশেষে তিনি ক্লান্ত হইতেছেন দেখিয়া প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

আমাদের ক্রীণ ভাষার আর পুরীর বর্ণনা সম্ভবে না। আমরা পূর্কেই বলিয়াছি, পুরী সম্বন্ধে তাবা যায় অনেক, লেখা যায় অল্প। অতি অল্পই লিখিলাম। দেখিবার, জানিবার, শুনিবার, পড়িবার—পুরীতে অনেক জিনিস আছে; কিন্তু সে সকল আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি নাই।

আর একটি কথা। চৈতন্তদেবের শেষ জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয়। একখাটা ভাবিলে পুরীর প্রতি আপনা আপনি একটা অজানা গভীর অমুরাগ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, গোপীনাথের ঘরে তাঁহার অস্তর্দান হয়; কেহ বলেন, অগম্যাথের ঘরে; কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসর্জন করেন। চৈতন্তচরিতামৃতে সমুদ্র পতন নামক একটা পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে জানা যায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু তবুও তাঁহার অর্জুদানের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; বড়ই আশ্চর্য।

আমরা সম্রাতি ত্রীখণ্ড, কাটোরা, নবদ্বীপ, কালনা প্রভৃতি চৈতন্ত-ভক্তি-প্রধান স্থান দেখিরা আসিয়াছি। এই সকল স্থানই চৈতন্তদেবের লীলার ভূমি, এই সকল স্থানেই তাঁহার স্মৃতি ধুমধামের সহিত পূজিত হইতেছে। এই

সকল স্থানের কোথাও আমরা তাঁহার তিরোধানের প্রকৃত কথা জানিতে পারি নাই। নিত্যানন্দের জীবনের পরিবর্তন দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহাদি করিতে ও ধর্মপ্রচারে সংসার বাজা নির্বাহ করিতে আদেশ করেন। নিত্যানন্দ সেই আদেশে দেশে প্রত্যাপ্ত হইয়া বিবাহ করেন। খড়মহের গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দের বংশ। এইরূপ প্রবাদ, নিত্যানন্দ চৈতন্তের ধর্মকে এইরূপ বিকৃতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্রহীনতা প্রস্রয় পার। নিত্যানন্দের কথা বলিয়া এইরূপ একটা শ্লোক দেশে প্রচলিত আছে ;—

“মংস্তের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হরি বোল।”

গোরাচাঁদের ধর্মের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অষ্টমত প্রভু গৌরচন্দ্রের নিকট এই রূপ একটা তর্জনা লিখিয়া পাঠান—

“আউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল,

আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল।

আউলকে কহিও কাজে নাহি কাউল।

এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল।”

এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন, এবং বলেন “যে ব্যক্তি আত্মান করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, তিনিই বিসর্জন দিতেছেন।” ইহার পর প্রায়ই যেখানে সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। শেষে হঠাৎ অন্তর্ধান হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, কেহই জানে না। চৈতন্তের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈষ্ণব ধর্মে নীক্ষিত করিয়াছে। পুরী, চৈতন্তের অতি প্রিয় স্থান। এই কারণে পুরী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় জিনিষ, কিন্তু দুঃখের বিষয়—পুরীতে চৈতন্তের তেমন কোন কীর্তি নাই। পাণ্ডুরা অগস্ত্যের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য বলেন, “তিনি অগস্ত্য দেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন।” ইহাতে অগস্ত্যের মহিমাই অপ্রতিহত রহিয়া গিয়াছে। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্তের ভক্তিপূর্ণ জীবন যে ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, পাণ্ডুর পক্ষে সে ভূমি যে অতি আদরের জিনিষ, সন্দেহ কি ? পুরী—জানীর তীর্থ; কেননা, শঙ্করাচার্যের ভূমি। পুরী বিষ্ণা-সীর তীর্থ, কেননা কবীরের বিচরণ স্থান। পুরী ভক্তের তীর্থ—কেননা চৈতন্তের শেষ লীলাভূমি। পুরী, এ অগতে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সমন্বয় কেন্দ্র। কেবল সমন্বয় কেন্দ্র নয়, হিন্দু ইতিহাসের একরূপ উজ্জল কেন্দ্র পৃথিবীতে বিরল।

উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম ও চিলকাহ্রদ ।

পুরী হইতে কটক ৫৩, চিলকাহ্রদ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১২ মাইল ব্যবধান। পুরী হইতে কটক পর্য্যন্ত অপূর্ব বাধা রাস্তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু চিলকা বা কণারক বাইতে হইলে সৈকতময় সমুদ্র তীর ধরিয়া বাইতে হয়,—বাধা রাস্তা নাই, কোনরূপ চটী বা আশ্রয় নাই—মধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, কিন্তু অনেক সময় পরিষ্কার পানীয় জল পর্য্যন্ত পাওয়া হুঁকর। আমরা চৈত্র মাসের প্রারম্ভেই চিলকা অভিযুগে যাত্রা করিলাম। রাত্রের আহাৰান্তে আমরা দুই বহু গো-যানে আরোহণ করিলাম। অন্ন সময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম। বিশাল বিস্তৃত পাতালস্পর্শী বালুরাশির তিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে, শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিল। এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই। গাড়ীর চাকা বালিতে পুঁতিয়া বাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, গাড়োয়ানের তীব্র কবাঘাতে সমস্ত রাত্রি যুহু যুহু ভাবে গরু হুটী চলিল বটে, কিন্তু তাহাতে অতি অল্প রাস্তা অতিক্রান্ত হইল। এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুরী-জেলার কয়েকটা স্থান পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে, দুই ধারে সম-শ্রেণীতে পরস্পর-সংলগ্ন বহু মুক্তিকা-নির্মিত গৃহ অপূর্ব ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতি পল্লীর শেষে হরি-সকীর্্তনের জন্ত সাধারণের ব্যয়ে নির্মিত ধর্মমন্দির—তাহার ধারেই তুলসী-মণ্ডপ; এতদ্ভিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুখেই একটা একটা তুলসী মণ্ডপ বিদ্যমান। আমরা বাঙ্গালার যত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্বত্রই শাক্ত ধর্মের প্রাধান্ত দেখিয়াছি। এমন যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, সেখানেও শাক্তধর্মের প্রাধান্ত বিদ্যমান। এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণা হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাদ দিলে, অতি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব-পরিবার দেখা যায়। বৈষ্ণবধর্ম, মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-মূলক ধর্ম যেন জ্ঞানীর জন্ত নয়—কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্ত? উৎকল পরিভ্রমণ করিলেও এ কথা সারবস্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম বাঙ্গালীকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম উড়িষ্যাকে অতি স্নকোশলে পরাজয় করিয়াছে। ইহাতে উড়িষ্যার শিক্কা-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়

কটে, কিন্তু উৎকলবাসী নরনারী যে বাঙ্গালী অপেক্ষা চরিত্রবান, বিবরে সন্দেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন অশিক্ষিত উৎকলবাসী ধর্মপিপাসু, সেবিবরে আমাদের সন্দেহ নাই। ভাল বল, আর মন্দ বল, উড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধর্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। আর বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণী অশিক্ষার বোর তমসান সমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর অল্পকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্মহীনতার স্রোতো অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালার মিথ্যা বোকদমার-বুদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র-প্রহেলিকা সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে অতি কঠিন সমস্তার নিম্ন করিতেছে। একথা কলিকাতার নিম্নশ্রেণী সহজেও খাটে। সুনিয়াছি, কলিকাতাতে যে সকল উৎকলবাসী থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি স্থগিত কাজে লিপ্ত। কলিকাতা-নিবাসী নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী যে কতদূর অধঃপতিত, বাহারা স্থিতিচিহ্ন দেখিয়াছেন, তাহারা আর উড়েদিগকে স্থগা করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়েও, পাণ্ডিগকে বাদ দিলে, উৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে উন্নত। অনেক লোকের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ সমূহ যে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, স্থির চিত্তে অনুসন্ধান করিলে গভীর-হৃদে প্রাণ সমাচ্ছন্ন হয়। ক্রণ-হত্যা বল, অসম-বিবাহ বল, ব্যভিচার বল, এ সকল কলঙ্ক বাঙ্গালার ধর্ম ও নীতিকে কণ্টকিত করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তঃপুর প্রথা বিদ্যমান, স্ততরাং বিধবাগণ কতক ক্ষরক্ষিতা; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কতক স্ত্রী-স্বাধীনতা বা অন্তঃপুর-প্রথা-হীনতা বর্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধবা বিবাহ নাই, স্ততরাং সেখানে বালবিধবাদিগের ধর্ম বা চরিত্র রক্ষার আর উপায় কোথায়? ২৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক নিম্নশ্রেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গালার ৮১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের মত্ততার নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক চরিত্রহীন। বাহারা হরিমাইতির জায় নয়, তাহারা প্রায়ই শুণ্ড প্রণয়ে অস্ত্রজ আবদ্ধ। সহর বা উপসহর, হাট বা বাজার ভিন্ন বেস্তা অতি অল্প স্থানে থাকে, স্ততরাং অশিক্ষিত ধর্মহীন যুবকের যৌবন-মত্ততার জন্ত যেন এদেশের হতভাগিনী বালবিধবাগণ বিদ্যমান। বাহাদের সুখের দিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বালবিধবা পিছুকুলে

অবহেলিতা, বস্তুরূপে পরিত্যক্তা! হায়! তাহাদের আশ্রয় কোথায়? বলিতে লজ্জা হয়, তাহাদিগকে ভাল কথা শুনাইতে বা মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে এ সংসারে যৌবন-মত্ত নররূপী পশু-গণ যেন কেবল বিদ্যমান। হায়! হায়! পুরুষের অভ্যাচারে যাহারা বালবিধবা, পুরুষের প্রলোভনেই তাহারা শৈরীগী, কলঙ্কিনী, কুলটা। বালিকা-বিবাহ পুরুষ প্রচলন করি-
 রাচ্ছে, স্ত্রুতরাং বাল-বিধবার শ্রষ্টা তাহারা। বিপত্নীক পতি দশবার বিবাহ করিবে, সমাজে নিন্দা নাই; দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে কলঙ্ক নাই; আর বাল-বিধবা—জীবনে কেবল ব্রহ্মচর্য্য করিবে!! হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রেমভরিপু যুবকগণ যে দেশে অহরহ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিতা বিধবা সে দেশে কেমনে অবিচলিতভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, তখন তাকেই বা রাখে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর এদেশের হত-ভাগিনী রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কলিকাতার প্রায় বারো আনা বেশী—বাল-বিধবা। রমণী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না! এমন ক্ষয়-বিধারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণনা করিতে পারে? উড়িয়াবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট স্থগিত, উপেক্ষিত; কিন্তু সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, কাজে কর্ণে উৎকলবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। একটা উদাহরণ দেখ—সম্মতির আইনের ঘোরতর আন্দোলনে, রমণী অবহেলার চূড়ান্ত নিদর্শন বাঙ্গলায় দেখিয়াছি; কিন্তু ধন্ত উৎকল-ভূমি! উৎকল-ভূমি আইনের পোষকতা করিয়া দেখাইয়া-
 ছেন যে, উৎকল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত। আর একটা উদাহরণ দিব। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, “কামিনীর কোল, মুখে হরিবোল” মতের জীবন্ত শিষ্য; কিন্তু যতদূর জানিয়াছি, এমন নেড়ানেড়ীর কাণ্ড উৎকলে নাই। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে, এমন কি, বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভিক্ষুকশ্রেণী দেখা যায়; কিন্তু উৎকলের বৈষ্ণবভিক্ষুক কলিকাতার বা বাঙ্গলার অন্ত কোথাও অতি বিরল। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক শ্রেণীকে ভিক্ষাকে সঞ্চল করিয়া জীবন কাটাইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যার বৈষ্ণব গৃহী, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান। আর বাঙ্গলার বৈষ্ণব

বৈরাগী, বেচ্ছাচারী, উচ্ছ্বল, চরিত্রহীন । বাঙ্গালার সহিত-উৎকলের
 তুলনা করিলে, একদিকে ধর্মের জন্ত ত্যাগস্বীকার, ধর্মের জন্ত প্রভূত অর্থ
 ব্যয় প্রভৃতি কার্যো বেরূপ উৎকল দেশীয় রাজাদিগের মহত্ব দেখা যায়,
 বাঙ্গলার সেরূপ বিরল ; অন্যদিকে ধর্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃহে
 প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎকল যেমন লালায়িত, বাঙ্গালা কদাচ সেরূপ নহে ।
 বাঙ্গালার অনেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নামাবলী পরিধারী কপট সন্তানী,
 ধর্মকে পরিচ্ছদের স্তার ব্যবহার করেন, আর উৎকলের অনেকেই ধর্মকে
 জীবনগত করিয়া স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা । চৈতন্ত মহাপ্রভু শেষ জীবন
 উৎকলে যাপন করেন, একথা সকলেই অবগত আছেন । ইহার গুঢ় কারণ
 অমুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গালাকে
 পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এমন কি, ধর্ম-মুহুর্দ নিত্যানন্দকে পর্যন্ত পরি-
 ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্ম-
 জীবনের প্রতি কোনই আশা নাই । বাঙ্গালা, উৎকল, দাক্ষিণাত্য, ভারতের
 বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উৎকলকেই ধর্মের অমুকুল বলিয়া মনে
 করিয়াছিলেন । কবীর, নানক, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্ত, বোধ হয়, ইহারা
 সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অমুরক্ত হইয়াছিলেন । অস্ত্রের কথা
 সাহস পূর্বক বলিতে না পারিলেও, মহাপ্রভু সম্বন্ধে এ কথা নিঃশংসরে
 বলিতে পারি । তিনি উৎকলের নরনারীর জন্মে ধর্মের এক অপরূপ বিমল
 জ্যোতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন । আমরা উৎকল সম্বন্ধে যে অভিমত
 আজ সাহস পূর্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রভুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ
 দিতে বিদ্যমান । বৈষ্ণবধর্ম উৎকলকে পরাজিত করিয়া আজও কতক
 পরিমাণে চৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের স্বর্গীয় মধুর ভাব সংরক্ষণে
 সমর্থ হইতেছে । উৎকলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা বেরূপ মোহিত
 হইয়াছি, উৎকলের ধর্মজীবন দেখিয়া তেমনি বিমুগ্ধ হইয়াছি । এমন
 বিমুগ্ধ ধর্ম-মাতোয়ারা প্রেমিক জীব পৃথিবীতে বিরল । তবে পুরীর পাণ্ডা-
 দেব কথা স্মরণ । পুরোহিত শ্রেনী সর্বত্রই কলুষিত-চরিত্র । কালী, কৃন্দাবন,
 বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাখ্যা, তারকেশ্বর, সর্বত্রই পাণ্ডারা ছরাচারী ।
 উৎকলের পল্লীর দৃশ্য অতি মনোরম । বহু পল্লাতে ধর্মের ছায়ার প্রমাণ
 পাওয়া যায় । এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা মৃত, উৎকল
 আজও জীবিত । ধন্ত উৎকল ! ধন্ত পুণ্যভূমি !

চিলেকার প্রবেশ পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিতে বাইরা আমরা অনেক অব-
 স্রিক কথার সমাবেশ করিলাম। অনেক পরীক্ষার্থী পরিকার পরিচ্ছন্ন, অনেক
 পরীক্ষার্থী জলের নারিকেল বৃক্ষ পরিশোধমান। আমাদের আশা ছিল, সাত-
 পাড়ার লবণ-আকিসে বেলা দুই প্রহরের সময় পৌছিতে পারিব, কিন্তু ক্রমে
 ক্রমে দুই প্রহর অতীত হইল, তখন তুলিলাম, মানিকপাটনা ডাকঘর বা সাত-
 পাড়ার লবণ-আকিস এখনও বহুদূর। দুই প্রহরের পর আমরা গ্রাম সমূহ
 অতিক্রম করিয়া বালুকামর প্রান্তরে পড়িলাম। সে দুর্গম পথে জন মেনে
 যা, আহাদের জন্য কদাপি পাওয়া যায়। অসহ্যভাবে মান হইল না, অনেক
 মহুসদানের পর রাত্তা হইতে বহুদূর গমন করিয়া একটু কর্দমময় সামান্য
 জলাশয় পাওয়া যাইল। আমাদের সঙ্গে যে কিস্তি খাদ্য জব্য ছিল, তদ্ব্য-
 এবং সেই কর্দমময় জল দ্বারা আমরা সে দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করি-
 লাম। উক্ত পথ বালুরাশির ভিতর দিয়া বাইতে যে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা
 লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। কিন্তু এত অসহ্য কষ্টের ভিতরও সুখ ছিল,
 কেননা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূমি সমূহ প্রান্তর আমরা এ পর্যন্ত দেখি-
 অসহ্যই দেখিরাছি। কোথাও কোথাও পরুতাকার বালুকার স্তূপ, কোথাও
 বাসুতাকনে বালুকাস্তরের তরকারিত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড।
 ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন রাজ্যে
 প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সে বিজনে পানী উড়ে না, গাভী চরে না, মনুষ্য
 কদাপি দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যই অতিক্রম করিতে
 হইল। সন্ধ্যার সময় জনপ্রাণী ও গ্রামের কিস্তি পরিচর পাওয়া গেল। দুই
 হইতে দুই চারিটা বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃশ্যও অতি সুন্দর। কিন্তু কোথায়
 চলিরাছি, কোথায় সে রাজি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তার গ্রাণ আকুল
 হইল। এমিকে গাড়োরান বলিল, সাতপাড়ার রাত্তা সে ভাল জানে না,
 মানিকপাটনার পথ জানে। আমরা সাতপাড়া বাইব। সেখানে লবণের
 ইনস্পেক্টর বাবু বেগীনাথব নুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাঁহার নিকট আমা-
 রের বন্ধু বিজয় বাবু একখানি পত্র দিরাহিলেন। ক্রমে রাজি হইয়া আসিল,
 কিন্তু সাতপাড়া এখনও দূর। রাজি বত বাড়িতে লাগিল, অগ্নে অগ্নে সমুদ্রের
 নির্ধৌব সে বিজনভা ভেদ করিতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম, আমরা সাত-
 পাড়ার নিকটে আসিরাছি। অনেক অহুসদানের পর সাতপাড়ার বেগী
 বাবুস আকিসের পরিচর পাওয়া গেল। একে একে সেই বিজনহানে করেক

যানি গৃহ চকুগোচর হইল, সে বেন বকুভূমির ওয়েলিস্, অকুলের কুল, গাড়ীর অরণ্যের আশ্রয়। গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি না থাকেন ? আরো ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি স্থান না যেন ! এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় বাইব ? ভাবিয়া কুল পাইলাম না। এরূপ বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া থাকেন, আমাদের প্রাণের সে সময়ের আবেগ কতক বৃদ্ধিতে পারিবে। ভাবিতে ভাবিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, অতুলস্থানে জানিলাম, বেণী বাবু তখন নিজা বাইতেছেন। সমের উষ্মে আরো বাড়িল। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা, কেমনে জানিব ? হঠাৎ সেই স্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আমাদের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পূর্বপরিচিত একজন বন্ধু। বিধাতা এই বিজন অরণ্যে আমাদের সেবার জন্য সেই পরিচিত বন্ধুকে রাখিয়াছেন, পূর্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই বন্ধুর বয়স ও আকর্ষণ দেখিয়া অবাক হইলাম। গাড়ীর দ্রব্যাদি সহ আমরা সাগরে বেণী বাবুর বাজলার আশ্রয় পাইলাম। বাজলাটা চিকার উপকূলে একটা উচ্চ পাহাড়ের ভ্রায় স্থানে নির্মিত। তাহার পূর্ব দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিকা হ্রদ ; ইহাতেই বৃদ্ধিতে পারা বাইবে, স্থানটা কতদূর মনোরম্য। বাজলার ঠিক দক্ষিণ দিক দিয়া একটা ছোট খাল সমুদ্র ও চিকাকে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। চিকা এবং সমুদ্রের মধ্যে এক ঋণ অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিকাকে সাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সেই অতুল শোভাময় স্থানে এমন আশ্রয় পাইব, জীবনে কখনও ভাবি নাই। বিধাতার কৃপা স্বরণ করিয়া চক্কর জল পড়িল। কিরংক্ষণ পর বেণী বাবু আগরিভ হইলেন। বেণী বাবু যেন সে রাজ্যের রাজা। চিকাতে যত লবণের কারখানা আছে ; ইনি তাঁহার কর্তা। তাঁহার অমাব্যিক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতুল বয়স, নিরহঙ্কার স্তুতি দেখিয়া মোহিত হইলাম। তিনি সেখানে যেন পিতৃহীনের পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর ভ্রায় সবরে আমাদিগকে তিনি গ্রহণ করিলেন। আলাপে বুঝিলাম, তিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ধর্ম সঘর্ষে নিশ্চিত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের ভ্রায় তিনি পৃথিবীর সংবাদ-অগং হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দেখিলাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটনা নাই। “প্রচার” নামক বাজলা

মাসিক পত্রিকা এবং অন্যান্য অনেক সংবাদ পত্র তাঁহার টেবিলে দেখিলাম । কথাবার্তার বুলিলাম, বাকীরা ভাবার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া একান্ত অমুদ্রাসী । রাত্রে তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল ; তিনি দেশের বর্তমান হীনাবস্থা শ্রবণে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন । মোট কথা, তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম । চতুর্দিকের অতুল শোভা, অন্ন জোৎস্নালোকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল । সমুদ্রের অবিভ্রান্ত গভীর নির্ধৌষ শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল, বেগী বাবুর বিজ্ঞতাপূর্ণ নানা বিষয়ক আলাপনে মানসিক তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল । এবং অবশেষে সুন্দর পরিপাটী সুখাদ্য রাজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়া মহাসুখে রাজশয্যায় শয়ন করিলাম । শয়ন করিয়া ভাবিলাম, বালুকানখ্যার পরিবর্তে একি ! চক্ষের জলে সুস্নাত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেদিন নীরবে বিধাতার চরণে অঞ্জলি দিয়া শয়ন করিলাম ।

পর দিন প্রত্যুষে বেগী বাবুর আদেশে এক ধানি সুন্দর জালীবোট সুসজ্জিত হইল, ৩।৭ জন মাঝী, আমরা ছুটি বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিয়া বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি চিত্তা-হৃদ দেখিতে নোকা ভাসাইলাম । সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল, সাগরগর্জন ক্রমেই তীব্রতর হইতে লাগিল, আমাদের নোকা পাল ভরে চিকার বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল । উত্তরে একটা ছোট দ্বীপে লবণের কারখানা (Salt Factory) । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা দ্বারা চিকার জল প্রবাহিত হইয়া দ্বীপে স্ফাপক হইতেছে ; দেই খানেই জল লবণে পরিণত হইতেছে । লবণের বর্ণ কর্দমের জায়, এই লবণ রাড় দেশে ও উৎকলে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ক্ষুদ্র দ্বীপের ধারে বহু এয়া নামক সুন্দর পক্ষী সকল জলে ভাসিতেছে, দেখিলাম । এয়ার পালক সাহেবদিগের বড় প্রিয়, খেত এবং লালবর্ণে পালকগুলি বিভূষিত । দেখিতে অতি সুন্দর । বড় মোলাম, রাজমুকুটের উপমুকুটই বটে । এই পক্ষীর পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে ।

চিত্তা হ্রদ, ২০০ বৎসরের উপর হইল, সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হ্রদ রূপে পরিণত হইয়াছে । জল সমুদ্রের জল অপেক্ষাও লবণাক্ত, কিন্তু জলের বর্ণ নীল নহে, ঘোলা পচা পুকুরের জলের জায় । চিকার জল বড় দুর্গন্ধময় । চিকার উত্তর সীমার খোঁর্দা সব ভিভিসন, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় । দক্ষিণের পাহাড়শ্রেণীর পর গজাম জেলা আরম্ভ হইয়াছে । পূর্বে দিকে অগ্রশব্দ

ଏକ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରୀୟ ବନ୍ଦୀ ନାମର ହଇତେ ଡିଙ୍ଗାକେ ପୃଥକ କରିହାନ୍ତି । ଡିଙ୍ଗା ୨୫ ମାଇଲ ଦୀର୍ଘ । ଡିଙ୍ଗାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣେ ଖେମାରିତ । ଉତ୍ତରର ଖେମ ୨୦ ମାଇଲ, ଦକ୍ଷିଣର ଖେମ ୫ ମାଇଲ । ପରିସ୍ଥିତି ୩୫୫ ମାଇଲ, ବର୍ଷାକାଳେ ୫୫୦ ମାଇଲ ହୁଏ । ଡିଙ୍ଗା ବଡ଼ ଗଭୀର ନହେ, ଅଧିକ ହଲଇ ୩ କି ୫ ଫିଟ ଯାତ୍ର, କୋନ କୋନ ହଲ ୩ ଫିଟ । ମହାନଦୀ କୈରାଟକ ନଦୀତେ, ଏବଂ କୈରାଟକ ନଦୀ ଏବଂ ତାମ୍ରବୀହେ ପରିଗତ ହଇସା ଡିଙ୍ଗାତେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି । କାନ୍ଥନ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସେ ଡିଙ୍ଗାର ଜଳ ପ୍ରବଳ ବଳବାନ୍ତ ହୁଏ; ବର୍ଷା ମସିହାରେ ଜଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପରିସାର ଓ ଶୁଦ୍ଧାହ ହୁଏ । ନଦୀର ଜଳର ଆଦିକ୍ୟ ବର୍ଷତହି ଶୁଦ୍ଧ ହଇସା ଥାନ୍ତି । ଡିଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟେ ନଳବନ, ପାରିକୋଦ, ଚୋରା, ସାରାଚଣ୍ଡୀ, ଚାରା, ଟାନ୍ଦି, କାରକୋଟି ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଦୀପ ଥାନ୍ତି । ପାରିକୋଦେ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜାର ବାସ । ନଳବନ ଏବଂ ପାରିକୋଦ ଦୀପ ୧୮୦୦ ଶ୍ରୀରାଜେ ସାରହାଟାଦିଗର ଦ୍ଵାରା ପରାଜିତ ହଇସାହିଲ । ଡିଙ୍ଗାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ୧୦୦୦ ଶିବମନ୍ଦିର ଥାନ୍ତି, ଏହିରୂପ ଜନପ୍ରସାଦ । ହଟ୍ଟାର ମାହେବଂ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିହାନ୍ତି ।

ଆମାଦେର କୁହ ମୋକା ପାଳତରେ ବିଦ୍ୟାବେଗେ ବହୁତ ବାରିରାଶି ଶେଷ କରିହା ଚଳିତେ ଲାଗିଲ । ସାରିରା ଆମାଦିଗକେ ପାହାଡ଼-ଶ୍ରେଣୀର ଶୋଭା, ହୁଏ ବର୍ତ୍ତୀ ଦୀପ ସମୂହର ଶୋଭା ଉଲ୍ଲାସେ ଦେଖାହିତେ ଲାଗିଲ । ଆମରା ଅବାକ୍ ଡିଙ୍ଗା ସମସ୍ତ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲାର । ନୋକାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ନଈ, ହାଲର ପ୍ରଭୃତି ଜଳଜନ୍ତୁର ଉଲ୍ଲାସେ ନୃତ୍ୟ କରିତେ, ଛୁଟାଛୁଟି କରିତେ ଓ ଜଳର ଉପର ଭାସିତେ ଲାଗିଲାର । ବୋଧ ହଇଲ, ଆମାଦିଗର ଦର୍ଶନେ ତାହାଦେର କୁହା ଏବଂ ଲୋଡ଼େର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଶୁଣେ ବୁଦ୍ଧି ପାହିରାନ୍ତି, ତାହି ଆମାଦିଗକେ ଖାସ କରିବାର କଥା ନୋକାର ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତେ ବୁରିତେଛି । ଏହିରୂପ ଶିବନ ଜଳଜନ୍ତୁ ଆମାଦିଗର ଅତି ନିକଟେ ନିକଟେ ବିଚରଣ କରିତେ ଆର କଥନଂ ଦେଖି ନାହିଁ । ବୋଧ ହଇଲ, ଏକ ବାର ନୋକା ଧାମି ଶୂନ୍ୟକ୍ରମେ ଜଳମୟ ହଇଲେ, ନିମେଷେ ଆମାଦିଗକେ ତାହାରା ଉଦ୍ଗମାଣ କରିହା ଫେଲିବେ । ଏକ ଦିକେ ଏହିରୂପ ବିଭୀୟକା, ଅପର ଦିକେ ଡିଙ୍ଗାର ଅପରୂପ ମୌଳିକା,—ଏକଦିକେ ସାଗରଗର୍ଜନ, ଅପର ଦିକେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ପାହାଡ଼-ଶ୍ରେଣୀର ଅତୁଳ ଶୋଭା—ସେହି ଦୂରଦେଶେ ଆମାଦିଗକେ ଯାତାହିରା ହୁଲିଲ । ଆମରା କୁହା ହୁକା ହୁଲିରା, ଫାର ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଙ୍ଗାବନ୍ଦେ ବିଚରଣ କରିଲାର । ସେ ଦିନ ଜୀବନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାହିରାନ୍ତି, ଏହି ଜୀବନେ କଥନଂ ତାହା ହୁଲିବ ନା ।

একটি আনন্দময় : তাঁর সমস্ত আনন্দকে বেঁচে রাখার জন্যে

স্বপ্নময় বেঁচে রাখার জন্যে সজাগ ছিল। স্বপ্নের চেয়ে
 হৃদয় হইতে না হইতে, আশার চিহ্ন তটস্থ এক উচ্চ ভূমির উপর বাইরা
 বসিয়া। অপরাহ্নে চিহ্নের বে দৃষ্ট দেখিলাম, তাহা তাহার ব্যস্ত করিতে
 পারি না। একমুহুর্তে স্বপ্নের কিরণ-ছটার চিহ্নের পশ্চিম তটস্থ পাছাড়াগুলি-
 পড়ি পড়ি হইতেছে, দূর-দূর-অতিদূরের বৃক্ষাশি ও অসংখ্য পরিমাণে চন্দ্র
 আনন্দাধীন হইতেছে, পাছাড়া-প্রাচীর-বেষ্টিত চিহ্ন আপন গৌরবে বায়ুপ্রবাহে
 উদ্ভাস তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে; অপর দিক্ হইতে অনতিদূরের
 সান্নিধ্য পূর্ণ দিক্ কাঁপাইয়া ছুটিতেছে। ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন ত্রুটি হইয়া ছুটিতে
 লাগিলেন, চিহ্ন-বন্ধ ক্রমে ক্রমে আরক্তিম আভার পরিশোভিত হইতে
 লাগিল,—বোধ হইল যেন স্বপ্ন সাগর-গর্জন-ভরে পূর্ণত-গুহার লুকারিত
 হইতে ছুটিতেছেন। সে যে কি মনোহর চিত্র, যে না দেখিয়াছে, তাহাকে
 কল্পনা করাই কঠিন।

ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন অন্তর্মিত হইলেন, চিহ্ন পরিগত হইল, কিন্তু এদিকে
 তরঙ্গ নবমিত। টানের অবিরামাশি যখন চিহ্নের বন্ধে বিভূত হইয়া পড়িল,
 তে আর এক স্বপ্নের দৃষ্ট। তুলিয়াছি, এইরূপ দৃষ্টান্তের মধ্যে স্বপ্নের দেবগণ
 বিহার করেন। আনন্দ নরকের কীট, কিন্তু আনন্দাও বিধাতার রূপার আজ
 বেঁচে দেবদানে বিহার করিলাম, নৃত্য করিলাম,—মামুষের সাধ্য বাহা, সব
 করিলাম। সে দেবদান অপবিত্র হইল কি না, জানি না; কিন্তু এই এক
 দিনের জন্য অন্ততঃ আনন্দ পবিত্র জীবন লাভ করিলাম।

এই রাজ্যেই আনন্দ আবার পুরী যাত্রা করিলাম। সব জীবন লাভ
 করিয়াছি—দেহ মন সব বলে বলীয়ান, পথ-কষ্টে এবার আনন্দ তত মগ্ন
 হইলার না। পর দিন অপরাহ্নে পুরীতে পৌছিলাম। রাজ্যীতে পুরী তখন
 ভরিয়া বিরাছে। রাজী-নিবাস সকল লাইসেন্স গ্রহণ করে নাই বলিয়া
 স্বপ্নময় সর্বত্র নিবাসে পাশ দিতেছেন না; একজন অনেক রাজ্যীকেই সমুদ্র-
 তটে বা বৃক্ষ তলার আশ্রয় লইতে হইতেছে। সরল জাহাজ জলময় হওয়ার
 পর কয়েক বৎসর পুরীতে রাজ্যী-বড় ভিড় হইত না বলিয়া রাজী নিবাসের
 লাইসেন্স লওয়া হইত না; এবার হঠাৎ আশাতিরিক্ত রাজী সমাপন দেখিয়া,
 নিবাসের অধিকাংশ লাইসেন্সের অস্ত-চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বপ্ন-

যাক্ষিক নসুজকে আশ্রয় নহিতে হইল। কিন্তু সে বিধান জানই হইল। কিন্তু
কিন্তু রাশিগণ হারিণ নীড়ার হৃত হইতে বহল পরিরাণে রক্ষা পাইলেন।
যাক্ষী সমাগম যেখিরা এক দিকে আনন্দ, এক দিকে আশঙ্কা উপস্থিত হইল।
কৃত্রিমিক হরণের আশ্রিত্য বিস্তার হইলে পুরী বা পুরীর পথ নিরাপদ নহে।
যাক্ষীর তিড়ে গাড়ী পাওয়া বাইবে না, সে আর এক ভয়। আমরা একই
ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু বে দু দিন রহিলাম, প্রাণ তরিয়া পুরীর উপর
স্বানন্দ সন্তোষ করিলাম।

এই দুই দিন অধিকাংশ সময়ই সমুদ্রের তটে কাটাইলাম। সমুদ্রের
তটে সমুদ্রের বহু কীট-কঙ্কাল পাওয়া যায়। আমরা প্রাণ তরিয়া কুড়াইলাক
পূর্ণিমার দিন দূর্য্য অন্তিমিত হইতে না হইতে সাগরের তটে বাইরা বসি-
লাম;—কেবল দুই রত্ন! পৃথিবীতে এ দিন আর অন্য সন্ধ্যা ভাল লাগিল না।
জীবনের গভীর ভূত মুহূর্ত্ত সমূহে একাকী থাকিতেই ভাল লাগে। একাকী
আসা আর একাকী যাওয়া—বিপদে বী ধর্ম্মের অঙ্গনে আর কাহার সন্নি-
সাক্ষাৎ হয়? আজ একাকী বাইতে পারিলাম না বলিয়া হজন পেশাব।
সন্ধ্যার পূর্ণিমার চাঁদ সাগর মাতিয়া আকাশে উঠিলেন;—সে হুজ যেখিরা
লাগরটা যেন অড়মেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবমেহ ধারণ করিয়া সচল হইয়া
উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাগরের উজ্জ্বল বৃত্তি হইল, অস্ত দিন যে পথের
তরঙ্গের অতিবাহিত পৌহিত, আর তাহা হইতে ৮। ১০ হাত উপরে আসিতে
লাগিল। আমরা প্রথমে যে স্থানে বসিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে সে স্থান
ছাড়িয়া চেউ উপরে আসিতে লাগিল। মৃত সাগর আজ আগিয়াছে—সে
আকাশের চাঁদকে যেন আজ গ্রাস করিবে। চক্রমা সাগর-প্রণয়ে বিলম্ব,
লাগিতে নাগিতে অতি নিকটে আসিয়া লজ্জা প্রযুক্ত যেন আর নাগিতে পারি-
তেছে না। বোধ হইল যেন চাঁদ সাগরের উপরে, অতি নিকটে ফুলিতেছেন,
আর উন্নত সাগর উজ্জ্বলের উপর উজ্জ্বল চড়িয়া উঠে ছুটিতেছে। কেণার
কেণার সমস্ত নীল জলরাশি যেত আত্মার পরিপূর্ণ,—আমরা দুই প্রাণী অবা-
চিতে আত্ম হারায়া চকিতচিত্তে দেখিতেছি। কি দেখিতেছি? মর্ত্যের পথ
না অর্ধের বৃত্ত? আজ গুণ ফুলিয়াছি, রিপু ফুলিয়াছি, সংসার ফুলিয়াছি—
আমরা আত্মহারা হইয়া উজ্জ্বল তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তখন ছুটাইয়া
তরিয়াছি, পূর্ণিমার সাগর উজ্জ্বলের আকর্ষণে তরলচেত অচেতন পুরী

আমরা সোঁ দিকের দিগন্তে গিয়েছিলাম ; আমরা অতঃ—কিন্তু আমরাই আজ তার দিকের দিগন্তে পারিলাম না। ইচ্ছা হইতে লাগিল, আসিয়াছি এখন তখন কখনও আসিবেই ; কিন্তু আজ এই উচ্চাঙ্গে প্রাণ ভাসাইলে যে স্বপ্ন পাইব, তখন মনে আর কোন স্বপ্নের তুলনা হয় না। আমরা তখন পাপল হইয়া মাটিতেছি, খেলিতেছি, পাইতেছি,—যাহা ইচ্ছা করিতেছি। বৃষ্টি মাছুষকে পাপল করিতেই সাগরের সৃষ্টি, বৃষ্টি বা মাছুষকে মাতাইতেই চাঁদের সৃষ্টি। হই-ই সৃষ্টির আশ্রয় মিনিস, হই-ই আজ আসরে নামিয়া আমাদিগকে ধরি-
য়াছে। রূপ দেখিয়া মাছুষ প্রেমে মজে, আমরা আজ বিধ্বংসে ডুবিয়াছি ; কিন্তু প্রেমের অতলে আমরা ডুবিতে পারিলাম কই ?

রজনী ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল,—সাগরগর্জন ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই—কেশমর উত্তাল তরঙ্গ ভিন্ন আর কোন দৃশ্য নাই। ডুবিতে বড়ই সাধ হইল। আমরা লজ্জা ভর্য বিসর্জন দিয়া এই দিন ভাবে ভোলা বিবসন পাগ-
লের ভাৱ রাখি ১২টা পর্যন্ত সাগর-মন্তোপ করিলাম। গভীর রাত্রিতে বাসার দিগন্তে, কিন্তু মন ফিরিল না। বৃষ্টি এ জন্মে সাগর হইতে আর মন ফিরাইতে পারিব না। আমাদের আপনার বলিতে যাহা, ঐ পুরীর সাগরে যাহা বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি।

আর এক দৃঢ় কণারকের স্বর্ঘ্য মন্দির ; পুরী হইতে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু আমাদের সেখানে যাওয়া হইল না। প্রথম কারণ, গাড়ী পাওয়া পেল না ; দ্বিতীয় কারণ আর কিছুই ভাল লাগিবে, মনে হইল না। কণারকের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ পুরীতে আনা হইয়াছে, তাহাতে কাল-
কার্যের আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছে। গঙ্গা বংশের [১১৯৮] প্রথম রাজা পুরীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন এবং উড়িষ্যার ধর্মবিপ্লব উপস্থিত করেন। এই সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিষ্ণুধর্ম। বৌদ্ধধর্ম ৫ম শতাব্দীতে শৈবধর্মে পরিণত হয়, এই শৈব ধর্ম ১২শ শতাব্দীতে বিষ্ণু ধর্মে পরিণত হইয়াছে। ১৩০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কার্যকার্যের প্রাধান্য। বৌদ্ধধর্ম বর্ত-
মান ভারতবর্ষে জৈনধর্মে পরিণত। ১১৯৭-১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে প্রথম জৈনমন্দির হয় ; ১২৩৭-১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে কণারকের স্বর্ঘ্য মন্দির লালুগীর নর-
সিংহ কর্তৃক নির্মিত হয়। স্বর্ঘ্য বংশ, সিংহ ও গঙ্গাবংশের মধ্যে। কণারকের মন্দির ১৫০ হস্ত উচ্চ, ব্যাস ১৯ হস্ত। এখানে আরো ২৩ মন্দির আছে। মন্দির আটটার দ্বারা বেষ্টিত ছিল, কিন্তু এখন আটটারেই চিহ্নও নাই। মন্দির

হাজারের শতক ভাঙ্গির পুরীতে, সহীরা বাগ, কেন্দ্রল কনবোহিন

সিংহ হাজারের তত্তাবধেয় বিদ্যাবান আছে। হতী ও সিংহ জুড়ি অতি

সবগ্রহ—সপ্ত দিবসের অন্তর কলক গুলি বড় স্থলর। এই কণারকের

মন্দিরের নিকটে চন্দ্রতাপা মহামেলা হয়। এ সময়ে আমাদের জনৈক

যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা সাদরে তুলিয়া দিলাম।

৯ “কণারকের সূর্যমন্দিরের শিল্প ও কারুকার্যের কথা আপনাকে আর কি জানাইব, যদি আপনি উৎকল জনপদের সময় কণারকে গিয়া থাকেন—তবে কতক বুঝিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় তাহা বাসের সপ্তমীর দিন যান নাই। আমরা ইংরাজদিগের কৃত অনেক অটালিকা ও সেতু ইত্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হই বটে, কিন্তু কণারকের সূর্যমন্দির দেখিলে ও সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান হয় ও বিস্ময় নিতে ইচ্ছা করে। সে সব শিল্পকারেরা বা এখন কোথায়? আর কি যন্ত্র দিরাই বা তাহারা এই সমস্ত খোদিত ও চিত্র বিচিত্র করিয়াছিল? একবার যদি তাহাদিগকে বা সেই সমুদয় যন্ত্র দেখিয়া পাই, তাহা হইলে সিবিল ও রয়াল ইঞ্জিনিয়ারদিগকে দেখাইয়া মনের কতকটা আপসোব ধর করি। ইংরাজেরা অগ্নি বর্ষণ করিয়া এই অপূরণ-মন্দিরের ধানিকটা তাসিয়া বেশিয়াছে।

আমরা যখন সূর্য মন্দিরের সম্মুখে গিয়া পৌছিলাম, তখন দেখিলাম, বোধ হয় লক্ষাধিক লোক এই দেউলের চতুর্পার্শ্বে সমবেত হইয়া, সকলেই রত্নন কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের কোলাহল ও চতুর্দিকের অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা সকলে পশুপাশে বন্ধ পূর্ণাহতি দিয়া, কি একটা অমূল্য নিখির আশার আপনা আপনি হড়াহড়ি কাঁচাকাড়ি করিতেছে। প্রায় এক স্থানে এত লোকের জনতা বা কোলাহল দেখিলে বা শুনিলে মনে কি অগ্নিবর্ষার আনন্দের উদয় হয়, সুখা তুকা কিছুই থাকে না। আমরাও সেই সঙ্গে মিশিয়া একটা পাহাড়টার দিনান্তের পর (আমার সুখা না থাকা সত্ত্বেও) এক দুটা বিচুড়ি উদরে দিলাম। সেই দিন ব্রাহ্মণ সম্রাটী থাকার আবারে তত বিরত হইতে হয় নাই। এখান হইতে চন্দ্রতাপা, গুলিগা, তিন মাইল হইবে; তখনই এক দুটা নাকে সুখে গুলিগা অতীত হানাতিস্থে সেই কলহমায়ে হাওয়া করিলাম; আমরা সেখানে রাত্রি আশ্রয় প্রাপ্ত একটা সেড়টার সময় গিয়া পৌছিলাম। এই তিন মাইল পথ কেবল এক হাটু গালি; আমাদের সঙ্গে সেই চাকর ও সেই বরকন্দাজ বা থাকিলে সেই রাতে চন্দ্রতাপা পৌছান দায় হইত, কারণ গাড়োরানের সাধ্য ছিল না—হু একটা লোকের সাহায্য বিনা বরকে এক পথ অগ্রসর করে। সেখানে পৌছিবার পর রাতের কোন বিষয় আমিত্তে পারিলাম না, কারণ আমি এই তিন দিবসের মধ্যে সেই রাতে বেশ একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া বাহা দেখিলাম, মন আনন্দে উৎফুল্লিত লাগিল। দেখিলাম, আমাদের গাড়ীর সম্মুখে আশ্রয় ২। ৩ বিঘা দূরিতে বর জল রহিয়াছে, কোথায় ২ দুট, কোথায় বা ৩-৪ দুট, কোথাও বা ৩ দুট জল রহিয়াছে। নদীকে এত অধিক ভূমিতে, বিশেষতঃ বাসুকান্দর প্রদেশে প্রায় জল থাকা কখনই সম্ভব হয় না। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ জল সকল কলহ মাঝে কি না, কেহই ইহার প্রকৃত উৎসর নিতে পারে না, কারণ এই নদী সপ্তমী দিন শুভীর্ণ হইবে কোন দিন এ স্থানে আসে না। কি সম্ভাব্য প্রদেশ। ইচ্ছা করে, এখানে এক বাসি পূর্ণ হইবে।

কি প্রাচীনের পিতৃ। এইরূপ কয়েকটি মিশ্র অসামান্য সৌন্দর্য্য, কলম কাহ
 নার কবিতা, দ্রিষ্ট মিশ্র পরিচয়ই আছে সৌন্দর্য্য, প্রাচীন সৌন্দর্য্য প্রবলী প্রাচীন গীতি
 এক এক বসন্ত মল খান করিল, সমস্ত দুইটি। প্রাচীন, দ্রিষ্ট ইহা মিশ্র সন পরিচয়ই আছে।

কি ভয়ানক বৃত্ত, যেখান থেকে আমার শিখরি উঠে।

আমি : তখন পলকায় সেখান, যন যে কি অবিচলতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইতে পারি।
 জাহা অশ্রুপরিধের ভাষ কবি হইলে কতকটা এখা তরির অধিত করিয়া আশ্রয় বৃত্ত বসিতাম।
 কলকাতার অস্ত্রত আশ্রয়ে হাতাইরা তুলিভাব। এখনে তপনসেব ঐহার আশ্রিতের নাম হইত
 থরির। আশ আশ দেখা নিলি বলি, "তুমি সীলোক, এত জনসমায়ে তোমার বাঁধা ভাব
 কী, তুমি তোমার আশ্রিতের আশ্রয়ে অবস্থান কর, আমি ধর্মকে পরিচয় করে আশ্রয়
 সারকালে আমিরা তোমার সনন তথা পান করিব, এবং আমার তত্ত্বপকেও বিদ্যমানরিতী সিন
 সেবীর স্রোতে কিঞ্চিৎ বিক্ষীর্ণ নিতে অবকাশ দিব"—এই বলিয়া তপনসেব ফর কলকাতার
 লভ্যপুত্র হয়ে এবেশ করাইরা গিয়া, আপনি পূর্ণজ্যোতিতে একাশ হইলেন।

এখন মরন-ভূমিকর বৃত্ত যেখান কাহার বন বা আশ্রয়ে উল্লাসিত হয় ?

হে হিন্দুধর্ম অভিমানিণ ! এক বার কলহারা শরীরকে কিঞ্চিৎ কটে দিকিণ্ড করিয়া এক
 বিশেষ অস্ত্রত বিখ্যাতর সীতলপ জীবন উৎসর্গ করিয়া একবার বাবী-সপ্তমীর দিন চন্দ্রাধা উপকূলে
 আসিয়া দেখ, আশ্রয়ের ৩০ কোটি সেবতার মধ্যে আজ আশ্রয় তপনসেব সানাসের সনেই তপন
 করিবার অস্ত্র কি তাহে উচিত হইয়া, কি তাহে ঐর আশ্রিতের কিরণ আল বিকীর্ণ করিভেছেন।

এই যে বাজ চন্দ্রাধা উপকূলে লক্ষ্যিক আশ্রি কত দেশ দেশান্তর হইতে সমবেত হইয়াছে,
 যেখান, এর মধ্যে সকলে কোথায় কিরিয়া হইতেছে ? জানা খেল বেন সকলেই এই বাজ
 পুষ্করিণীতে হাব ও তপনসেবকে বর্ণন করিবার অস্ত্র আদিরাহিল,—বেন তপনসেব ইঙ্গিত করিয়া
 ক্ষণেক বিধায়ে কখন বা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল "তাহা ত পূর্ণ হইল ? আর
 আমার কি আছে যে দেখিবে ?" বখনই বিদ্যাতীর বসিকৃপ তারতাতিমুখে বাপিভা বাজা করিবার
 সক্ষম করিয়াছে, তখনই বুকিতে গারিরাছি, বা জানি ভারত বন্ধকে কতই পদাঘাত কর
 করিতে হইবে। সেই অবধি আমার মন সমাই নিরানন্দ, সেই দিন হইতে তোমাদের আশ্রয়
 প্রতি তত অস্ত্রা তক্তি নাই, আর সেই দিন হইতে তোমাদের অঙ্গপাতের দিন আরম্ভ হইয়াছে।
 "ওঃ ! সেই দিনের কথা মনে হইলে তোমাদিগের নিকট যুগ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। এক
 দিন আমি আমার মননভিত চাককাব্য বিনির্মিত ঐ কণারকের অটালিকার নিকট গিয়া দেখি,
 ক্ষেত্রপ লবল সনেত পরিবেষ্টিত হইয়া জানি না—কি আশ্রয়—তাহার। আমার অটালিকার
 অগ্নি গোলা বর্ণন করিতেছে। তখন তোমরা আমার মূলের দিকে একবারও তাকাইলে না।
 বরক দেখিয়া বিবৃত হইলাম—করেকজন হিন্দু সন্তান তাহাদিগের নিকট আমার মূলের
 অটালিকার অনেক সন্ধান বলিয়া গিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক আমার
 অটালিকা ভাঙিয়া কেহিবার সন্ধান দেখিতে আসিয়াছে। এই সব দেখিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম,
 আর সে দিকে না তাকাইয়া উদ্ধাশে লক্ষ্যার্থ সেবের মনিরের এক পার্শ্বে গিয়া-চাঁপ হাঙিয়া
 বাঁটিলাম। এখন আমি কোন বিধি হাশে তপসেক। হৈম অটালিকার অধিত হইয়াছি ;
 তোমাদিগকে জানাইতে ভর করে, পক্ষে আমার তোমরা বৃত্ত করিয়া-ঐ কণারকের অটালিকার
 ভাষ ইহারও ঐরপ মূর্ত্তা কর। তবে এই পৃথক বসিতে পারি, লগনসেবের আশ্রিতের মূর্ত্ত

দ্বায়ে তীব্র শব্দ করিতে করিতে আমাদের গাড়ী আবার রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। সেই নিম্নক রজনীর নিম্নকতা ভঙ্গ করিতেছিল, আমাদের গাড়ীর শব্দ এবং বিজনতা সন্তোষ করিতেছিল, মধুর হইতেও মধুরতর দিগন্তব্যাপী সেই বাসন্তী পূর্ণিমা। পৃথিবীর সব ঘুমাইয়াছে—মাগুব ঘুমাইয়াছে, পাখী ঘুমাইয়াছে, পশু ঘুমাইয়াছে, বৃক্ষ ঘুমাইয়াছে—সারানিশি জাগিয়া রহিয়াছে কেবল ঐ আকাশের নিকলক চাঁদ। দিক্ ছাইরা, আকাশ ছাইরা, মাটি ছাইরা খেলিতেছে, কেবল বিমল জ্যোৎস্না-রাশি। এমন একাধিপত্য আর দেখি নাই! এই অতুল শোভা দেখিয়া কে ঘুমাইতে পারে? এই বিমল রজত-নিশিতে আমরাও ঘুমাইতে পারি নাই।

পরদিন আমরা কটকে পৌঁছিলাম। অবশিষ্ট যাহা দেখিবার ছিল, কয়েক দিনের মধ্যে দেখিয়া লইলাম। কটক টাউন-হলে “সান্ত্ব ও অনন্ত” বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলাম এবং ছাত্র সমাজের সভাপণ সহ এক বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটি সুন্দর বাড়ীতে বিধাতার উৎসব সন্তোষ করিলাম। কটকের অপূর্ণ শোভা স্বরূপ, বার্ককোও নবোৎসাহে মত্ত জগমোহন বাবু আমাদের সহিত থাকিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় ভগবৎ প্রসঙ্গে কাটাইলেন। অপরাহ্নে আমরা সেই বাড়ীর ছাদে বিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, কোন বাঙ্গালী বাবু, এই বাড়ীতে রজনী সন্তোষ করিবার জন্ত, বিলাসিতার নানা প্রকার উপকরণ লইয়া উপস্থিত। যে বাড়ীতে আমরা বিধাতার নামে উৎসব করিলাম, সেই বাড়ী অপবিত্র কার্যের লীলাক্ষেত্র, ভাবিয়া মনে বড়ই বেদনা পাইলাম। বাড়ী-রক্ষকের উত্তেজনার আমাদেরিগকে শেষে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইল।

আর যে কয় দিন কটকে রহিলাম, সে কয় দিন প্রক্বে মধুহৃদন বাবু বড় ব্যস্ত ছিলেন। তখন স্কুল-ইনস্পেক্টর বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় কটকে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত। আমরা স্কুলের বাবু মতিলাল সিংহের সাহায্যে এবং আরো কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়া কটক পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

এইবার হাই-লেবেল কেনেল ধরিয়া আমরা বিরজা-ধাম জাজপুরে যাইব। স্কুল-ইনস্পেক্টর বাবু আমাদের সঙ্গ লইলেন। সহকারী ইনস্পেক্টর বাবু রাখানাথ রায় এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু মধুহৃদন রায় মহাশয়গণ ইনস্পেক্টর বাবুর সহিত চলিলেন। বলা বাহুল্য যে, যাত্রা মধুর হইল। আন্তর্গৃহীক সমস্ত ঘটনা লিখিতেছি।

আমরা আহুমানিক ১০ ঘটিকার সময় আহারের কার্য সমাধা করিয়া কটকের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি, জাহাজ ঘাট ছাড়িয়া মহানদীতে তাসিয়া

জল-স্বতন্ত্রতা ।

কতকদূর সিয়াছে। ষ্ট্রিমার পাইলাম না বলিয়া ক্ষোভ হইতে লাগিল। কিন্তু জাহাজের লোকদিগের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে দেখিয়া জাহাজের গতি স্থগিত করিলেন। আমরা নৌকার চড়িয়া জাহাজে উঠিলাম। রাধানাথ বাবু আমাদেরকে সুন্দরে গ্রহণ করিলেন। জাহাজ ধুম উড়াইয়া, জল নাচাইয়া, তট কাঁপাইয়া, বেগে চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে মহানদী ছাড়িয়া আমরা হাই-লেবেল খালে উঠিলাম। কেনি খালের জল মহানদীর জল হইতে নিম্ন, কোন খালের উচ্চ—এই নিম্নতা ও উচ্চতা অনুসারে Low level ও High level খালের নামকরণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন Coast canal আছে। কিরূপে নিম্ন জলরাশি হইতে উচ্চ জলরাশিতে জাহাজ উঠে, কিরূপেই বা নিয়ে নামে, বুঝান বড় কঠিন। একটু চেষ্টা করিতেছি। কেহ বুঝিবেন কি না, জানি না। খালের মধ্যে কতকটা ব্যবধান রাখিয়া, দুটি কবাটওয়াল বাঁধ থাকে। প্রথম বাঁধের কবাট খুলিয়া দিলে, উভয় বাঁধের ভিতরের জল বাহির হইয়া যায় এবং যে নিম্ন-জলরাশিতে জাহাজ থাকে, তাহার সমান হয়। যখন জল সমান হয়, তখন জাহাজ চালাইয়া উভয় বাঁধের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং যে কবাট খুলিয়া দিয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া অপর কবাট খুলিয়া দেয়। অপর কবাট খুলিবামাত্র ক্রমে উচ্চ খালের জল আসিয়া উভয় বাঁধের মধ্যে পড়িতে থাকে এবং নিম্নস্থিত জাহাজকে উচ্চ খালের সম-স্থানে তুলিয়া দেয়। বাঁধের জল যখন খালের জলের সমান হয়, তখন জাহাজ চলিতে থাকে। এই রূপ প্রণালীতে জাহাজ নিয়ে নামে ও উঠে উঠে। পাহাড়ময় দেশে এই রূপে জল বাঁধিয়া, খাল দ্বারা চালাইয়া, কৃষিকার্য চলিতেছে এবং বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছে। ইহা গবর্ণমেণ্টের এক অভূত কীর্তি। খালের জল কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন কেন? একথার উত্তর এই, উচ্চ ভূমিতে খালের জল উচ্চ এবং নিম্ন ভূমিতে নিম্ন রাখিতে হয়। এই খালের জল দ্বারা কৃষিকার্য নিষ্পন্ন হয়। কৃষকদিগকে এই জল-কর (একর প্রতি ১৥০ কি ২৮) দিতে হয়। জল-করে উৎকলে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভ হয়।

আমাদের জাহাজ এই খাল ধরিয়া চলিতে লাগিল, আবশ্যকতা অনুসারে নিম্ন হইতে উঠে উঠিয়া, বাঁধের পর বাঁধ পার হইয়া চলিতে লাগিল। রাধানাথ বাবুর হস্তে একখানি সংস্কৃত পুঁথি। তিনি ও ব্রহ্মমোহন বাবু উচ্চ শ্রেণীর টিকিট লইয়া ছিলেন, আমরা নিম্নশ্রেণীর টিকিট লইয়াছিলাম। চতুর্দিকের পাহাড়শ্রেণীর

শোভা দেখিবার জন্ত আমরা ডেকের উপর বসিয়াছিলাম। রাধানাথ বাবু আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া ডেকের উপর ছিলেন। তিনি দূর হইতে গণেশধাম দেখাইয়া আমাদেরকে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ বলিতেছিলেন। আমরা উৎকলের বিবরণ শুনিতে শুনিতে, চতুর্দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে, দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিনের মধ্যে আমরা আকুয়াপদা পৌছিতে পারিলাম না। পৌছিতে রাত্রি হইল। এই স্থানে রাধানাথ বাবুর সহিত আমরা পৃথক্ হইলাম। আমরা জাজপুর যাইবার জন্ত তিন জন আকুয়াপদায় অবতরণ করিলাম।

কটক যেমন মহানদীর উপরে, আকুয়াপদা সেই রূপ বৈতরণীর উপরে। কটকের ধারেই মহানদীতে বিস্তৃত বাঁধ, আকুয়াপদাতে বৈতরণী নদীতে বাঁধ। এই বৈতরণী জাজপুরের মধ্য দিয়া চাঁদবালা হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে। আকুয়াপদার বাঁধের পশ্চিম দিকে বৈতরণীতে অনেক জল, পূর্বাংশে সামান্য জল,—পশ্চিমাংশের জলরাশির কিছু কিছু বাঁধের ফাঁক দিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে পূর্বদিকে পড়িতেছে—এই সামান্য প্রবাহ বৈতরণী-বন্ধের বালুকারাশির উপর দিয়া তির তির করিয়া যাইতেছে।

আমরা সেই রাত্রি আকুয়াপদায় কাটাইয়া পরদিন প্রত্যুষে জাজপুর পদব্রজে রওয়ানা হইলাম। বৈতরণী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল। ৩৭ মাইল গথ। আকুয়াপদা হইতে জাজপুর পর্য্যন্ত আর একটা খাল তখন নূতন খনিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্ত খোলে নাই, নচেৎ আমাদেরকে হাটিয়া যাইতে হইত না। উৎকলের বহু গ্রামের ভিতর দিয়া, মধুহদন বাবুর নিকট উৎকলের বিভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা চলিতে লাগিলাম। উৎকলে জীশিকা প্রচলিত আছে, শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে (উৎকলে দেবর পতি), ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, এ সকল কথা শুনিয়া অনেক ভাবিলাম, অনেক চিন্তা করিলাম। বাঙ্গালীরা অসত্য বলিয়া উৎকলবাসীদেরকে নিন্দা করেন, সামাজিক বিষয়ে বাঙ্গালীদের অপেক্ষা তাঁহারা অনেক উন্নত, বুঝিয়া অবাক্ হইলাম। কপটতাপূর্ণ ধর্ম্মভাবে তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

জাজপুর ১.

দশটা কি এগারটার সময় আমরা কটক জেলার সুবডিবিসন জাজপুরে পৌঁছলাম। ঘুরিয়া কিরিয়া যাইতে, বালুকাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইতে এবং গল্প করিতে করিতে বাওয়ার অনেক বেলা বাড়িয়া গেল। মধুসূদন বাবু সঙ্গে ছিলেন, স্ততরাং আমাদের আর কোন রূপ কষ্ট হইবার কথা ছিল না। জনৈক সদাশয় সব-ইনস্পেক্টর বাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। প্রথমে রৌদ্রের তীব্রতেজে আমরা ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। জাজপুরের নারিকেলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ হইল; এবং স্নান আহ্বারে শরীর শীতল হইলে আমরা ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম। ইতিমধ্যে মধুসূদন বাবুর ইঙ্গিতে, স্ততঃ বাসায়, সাংকালের আহাঙ্গাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

ঋষিকণ্ঠা নদী হইতে বৈতরণী পর্য্যন্ত ৪টা তীর্থ-ক্ষেত্র। পার্বতীক্ষেত্র—জাজপুর, ১০ ষোড়শবাপী; হর-ক্ষেত্র—ভুবনেশ্বর; অর্ক-ক্ষেত্র—কণারক; কৃষ্ণক্ষেত্র—পুরী। বিরজা-ক্ষেত্র, রজঃশ্রুতা দেবীর আবির্ভাব স্থান; এখানে দেবীর ধ্বংস-কারিণী মূর্তি। জাজপুরের কীর্ত্তিরাশি এখন অনেক মৃত্তিকা-গর্ভে, কিন্তু এস্থলে যাহা দেখিলাম, একরূপ আর কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম, জাজপুরে প্রায় দশ সহস্র ব্রাহ্মণের বাস। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক স্থান দেখিলাম। যে সকল অপূর্ণ কীর্ত্তির ধ্বংস দেখিলাম, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য। এক স্থানে দেখিলাম, মৃত্তিকা খুড়িয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু গবর্ণমেন্ট অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, মূর্ত্তির উদগর পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছে। একরূপ প্রস্তর-নির্ম্মিত বিরাটমূর্ত্তি আমরা আর কখনও দেখি নাই। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইল। মন্তকের দৈর্ঘ্য, মাগিয়া দেখিলাম, ২২ হাত। সমস্ত মূর্ত্তিটা প্রায় ১৩ হাত (২০ ফুট), মূর্ত্তির নাম শান্তমাধব। এত বড় মূর্ত্তি উত্তোলন করিতে গবর্ণমেন্ট অকৃতকার্য্য হইয়া কেলিয়া রাখিয়াছেন। একখণ্ড প্রস্তরে এত বড় মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতে পারে, পূর্বে ধারণা ছিল না।

কণারকের যেমন অল্পগন্তব্য, জাজপুরের তেমনি শুভতন্ত। শুভতন্ত প্রাচীন কালের এক অদ্বুতকীর্ত্তি। মহুমেন্টের স্তায় আকাশস্পর্শী এক খণ্ড মন্থন প্রস্তর, কান্দকার্য্যের অক্ষর কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য, সময়ের বন্ধে বহু বৃগু বৃগান্তর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক অপূর্ণ দর্শন! দেখিয়া নয়ন ভ্রষ্ট হইল।

আদালত-প্রাঙ্গনের এক স্থানে গবর্ণমেন্ট বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্তি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সে সকল মূর্তিই প্রকাণ্ড এবং কারু-কার্য্য পূর্ণ। বাঙ্গালাপ্রদেশে একুপ একটা মূর্তিও কোথাও দেখা যায় না। আমরা রাণী ভবানীর বড়-নগরের ভগবতী মন্দির দেখিয়াছি, রাজবল্লভের এবং তদীয় বংশধরগণের রক্ষিত প্রাচীন বিগ্রহসমূহ দেখিয়াছি; সে সকলের মধ্যে প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিগুলি গণনার আনা যায় না, সে সকলের অধিকাংশই ধাতু-নির্মিত, কোন কোনটা স্বর্ণ-নির্মিত। রাজবল্লভের বংশধরগণের (জগন্নাথ বাবুদের) কীৰ্ত্তি-কলাপ কীৰ্ত্তিনাশার গর্ভশায়ী হইয়াছে, একটা প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ এবং আর কতকগুলি প্রস্তর-নির্মিত বিগ্রহ তাঁহারা মন্দিরীতে রক্ষা করিয়াছেন। সে সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের। তাহাতে দেখিবার এবং ভাবিবার জিনিস থাকিলেও, মোহিত হইবার জিনিস নাই। কিন্তু জাজপুরের মূর্তি সমূহ দেখিলে মোহিত হইতে হয়। একটা ছুটী নয়—এইরূপ বহুমূর্তি প্রাঙ্গনে সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই সকল মূর্তির নাম জানিতে চেষ্টা করিয়া জানিয়াছি, কোনটির নাম বারাহীমূর্তি (মহিষাসনা), কোনটির নাম চানুঙা, কোনটির নাম চতুর্ভূজা (হাটুতে বালক), কোনটির নাম ঐন্দ্রী (গজাসনা), কোনটির নাম কোমারী (ময়ূর বাহনা), কোনটির নাম বৈষ্ণবী (গরুড়বাহনা), কোনটির নাম নারসিংহী, কোনটির নাম মহালক্ষ্মী (পদ্মাসনা)। এ সকল নাম ঠিক কি না, জামি না; নাম যাহাই হউক, এ সকল অদ্ভুত কীৰ্ত্তি। এ সকলের ঐতিহাসিক বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ যদি জাজপুরের দেব দেবীর ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, দেশের এক মহা অভাব দূর করা হয়। আমরা ছই একজন প্রাচীন পণ্ডিতের নিকট কিছু কিছু বিবরণ অবগত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে সকল প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় নাই, এতদ্বারা উল্লেখ করিলাম না।

মুক্তিমণ্ডপ—এক আশ্চর্য্য জিনিস। ইহাও আদালত প্রাঙ্গনের নিকটে স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলাম, ইহা যযাতি-কেশরীর ব্রাহ্মণগণের বিচার-স্থল। ইহা ব্রাহ্মণগণের তদানীন্তন কালের সঙ্গত-স্থল। এক দিকে প্রধান বিচারকের আসন, অপর তিন দিকে অস্ত্রাস্ত্র বিচারকগণের (শালিসগণের) বসিবার প্রস্তর-নির্মিত আসন সজ্জিত রহিয়াছে। সমগ্র-সঙ্গতস্থলটা রাতার সমতল ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ সংস্থাপিত। ইহা দেখিলে জুরির বিচার-প্রথা অল্পরূপ বিচার-প্রণালী যে ঐ সকলে প্রাচীন সময়ে ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালের দর্পে সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু এই স্থানটী যেখানে কত
কথা যে মনে জাগে, বিধাতাই জ্ঞানেন।

জাজপুরের প্রধান দর্শনযোগ্য বস্তু দশাখমেধবাটি, বয়ুহমন্দির, জগন্নাথ-মন্দির, বিরজা-মন্দির ও শুভস্তুভ। বিরজামন্দির প্রধান তীর্থস্থল; করাল-বদনার ভীষণ সংহারমূর্তি দেখিলে কত ভাব মনে জাগে। শুনিলাম, জাজ-পুরের বিমলা-মূর্তি পুরুষোত্তমে নীত হইয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্ত লোপ করিবার জন্য এইরূপ করা হইয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাক্ষনে ছত্রিশ জাতির অন্ন বিক্রীত হয়। সকলেই জানেন, পুরীতে জাতিভেদ নামক কোন পদার্থ নাই। জগন্নাথের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একত্র বসিয়া গ্রহণ করিতে হয়। জাতিভেদ-নাশ বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন। জগন্নাথদেবের মূর্তিও বৌদ্ধধর্মের অপভ্রংশ মূর্তি। হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন-সময়ে শাক্তধর্মের মাহাত্ম্য পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পুরুষোত্তমের জগন্নাথ-মন্দিরের প্রাক্ষনে বিমলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মূর্তি জাজপুর হইতে নীত। সত্য মিথ্যা, বিধাতা জানেন। আমরা বিরজা-ধামের মহীষসী কীর্তি-কলাপ দেখিয়া মোহিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

জাজপুর উৎকলের ৪র্থ নগর।—৬৩০ এবং ৬৫০ খ্রীঃ পূর্ব অব্দে চীন পরি-
ব্রাজক এই নগর পরিদর্শন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে জাজপুর উড়িষ্যার রাজ-
ধানী ছিল। এই সময়ে অযোধ্যা হইতে ১০০০ ব্রাহ্মণ আনীত হন। বোড়শ
শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমানের বিখ্যাত সমর এইখানে হয় এবং মহম্মদীয়
প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরাজেরা এই
স্থানের অনেক কীর্তি বিনষ্ট করিয়াছেন। জাজপুরের বরাহমন্দির ১৫০৪
হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। *
১১৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিমলা পুরীতে নীত হয়েন। এই সময়ে শৈবধর্ম স্থলে বিষ্ণু-
মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণু গয়ানুরকে বধ করেন। জাজপুরের নদী
বর্তমান সময়ে কটক ও বালেশ্বর জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে। শিবের পর
বিষ্ণু বা জগন্নাথের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ভুবনেশ্বর ও জাজপুরের
প্রাধান্য লোপ হইলে কটক রাজধানী হয়। মকর কেশরী কটকের বাঁধ
প্রস্তুত করেন। জাজপুরে এক সময়ে ২১৬৯ ঘর এবং ৯১৮০ জন লোকের
বাস ছিল। জাজপুরে পাঠানদিগের গোরবান আছে, ইহাতেই প্রতিপন্ন

হয় যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে মসজিদও আছে। কিন্তু সে সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

জাজপুরে উনেকোটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক লিঙ্গের বিশেষ নাম আছে। আগেরেশ্বর নামক মন্দিরের শিবলিঙ্গ দিবসের মধ্যে বহবার রূপ পরিবর্তন করেন। আমরা সেই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব দেখিয়াছি। এমন প্রস্তরে ঐক্য হইয়াছে যে, সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধি ও হ্রাসের সহিত ইহারও রূপান্তর হয়। কথিত আছে, এই সকল লিঙ্গের পাথর নীলগিরি হইতে আনীত হইয়াছিল।

সমস্ত মন্দিরের বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়। আমরা ঘুরিয়া ২ একে একে সমস্ত দেখিলাম। ইহার মধ্যে একদিন জাজপুরে একটা মেলা হয়। ঐই মেলার সময় বহুদূর হইতে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল; নদীগর্ভে বালুকাময় স্থান সমূহে অসংখ্য দোকান বসিয়াছিল। সে এক অপূর্ণ দৃশ্য। কত রকম রকম লোক, কত রকম রকম ঘটনা দেখিয়া আমরা ধস্ত হইলাম। জাজপুরে তীর্থ না করিলে হিন্দু যাত্রীর উৎকল-ভ্রমণ ব্যর্থ হয়। এখানে গয়ান্দ্রের নাভিগয়া আছে, সেখানে পিণ্ড দিতে হয়। বৈতরণী তীর্থ হিন্দুর প্রধান-তীর্থ। এখানে আসিয়া তীর্থ না করিলে হিন্দুর মুক্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। বিরজা-মন্দিরে বিরজা, গণেশ, ভৈরব ভৈরবী ও কার্তিকমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপূজার সময় এখানে রথযাত্রা হইয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মকুণ্ডও একটা প্রধান তীর্থ। নৃসিংহনাথ মন্দিরে রঘুনাথ ও গুরুদ মূর্তি আছে।

আমরা সর্পাপেক্ষা মোহিত হইয়াছিলাম, জাজপুরের সপ্তমাতৃকা দেখিয়া। একটি ঘরে সপ্তমাতৃকা মূর্তি রক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে পূজা ইত্যাদির কোন চিহ্ন দেখিলাম না। সপ্তমাতৃকার ঐতিহাসিক বিবরণ শুনিলে এমন লোক নাই, বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে। বিচিত্র ও অদ্ভুত কীর্তি। চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী মাতৃকা নহেন। বিষ্ণুর শক্তি বারাহী, বৈষ্ণবী, ও নারসিংহী। সপ্তমাতৃকার নাম এই (১) বারাহী (২) ঐক্ষী, (৩) বৈষ্ণবী—ছায়াদেবী, (৪) কোমারী, (৫) মাহেশ্বরী, (৬) নারসিংহী, (৭) ব্রাহ্মণী। এই সকল মূর্তি প্রস্তর-খোদিত, মনুষ্যের আকারে গঠিত। অপূর্ণ গঠন। দেখিলে মোহিত হইতে হয়।

জাজপুরের অপূর্ণ কীর্তিকলাপ দেখিয়া আমরা যারপর নাই আশ্চর্য হইলাম। একজন বিধাত পণ্ডিতের সহিত অনেক বিষয়ের কথোপকথন

হইল। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অমারিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহা এবং অভ্যন্তর ব্যক্তিগণের উত্তেজনায় এখানেও আমাকে একটা বক্তৃতা প্রদান করিতে হইয়াছিল। জাজপুরে অনেক বিখ্যাত টোল আছে। আমরা দুই একট দেখিতে গিয়াছিলাম। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলে তাহুল(পাণ) দেওয়ার এদেশের বিশেষ রীতি। পাণের লিখিতে উগ্র গুণ্ডি (গুড়ি বিশেষ) থাকে, পূর্বে জানিতাম না। গুণ্ডি, তামাক ও নানা মসলায় প্রস্তুত। হঠাৎ এক বাড়ীতে খাইয়া আমরা হতচেতন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিলাম। পাণ খাওয়া উৎকলের বিশেষ রীতি। যে ব্যক্তি রোজ ১০ রোজকার করে, সেও রোজ ১০ পয়সার পাণ খাইবে। সুনির্লাম, অতি প্রাচীন কালে পাণ খাওয়ার নিয়ম ছিল না। বাঙ্গলা দেশে হইতে প্রথম বাকুই উৎকলে যাইয়া প্রথম পাণের চাব করে। ক্রমে ক্রমে পাণের চলতি হয়। এখন উৎকল পাণময় দেশ হইয়া পড়িয়াছে। মাহুঘ ভাত না খাইয়া দুই দিন থাকিবে, কিন্তু পাণ বিনা একদিনও চলিবে না। পাণের এমন আধিপত্য কোন দেশেও দেখি নাই। জাজপুরের ব্রাহ্মণ-বসতি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভক্তি হয়। জাজপুরের ব্রাহ্মণ-বসতি দেখিলে উৎকলকে কেহই বঙ্গপ্রদেশ হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না। জাজপুর কটকের শেষ উপসহরে এখন পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন অক্ষর প্রস্তুত-ধোদিত মূর্তি সকল বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা মধুসূদন বাবুকে জাজপুরে পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রক যাত্রা করিলাম। ভদ্রক যাইতে হইলে আবার আকুয়াপদার ফিরিয়া আসিতে হয়। আমরা ভগ্নমনে, জাজপুরকে বিজয়াদশমীর প্রতিমাবিসর্জনের জ্বায় বিসর্জন দিয়া, আকুয়াপদা পৌছিলাম। রাত্রিতে জাহাজ যাইবে। আকুয়াপদার বঙ্গগণের যত্নে আহাতি করিয়া খালের ইঞ্জিনিয়ার বাবু অন্নদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের ভবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কারণ এই, রাত্রিতে যখন জাহাজ আসিবে, তখন তাহাকে ডাকিবেই ডাকিবে, তিনি সেই জাহাজে ভদ্রক যাইবেন। আমরাও তাঁহার সহিত গেলে ভালভাবে যাইতে পারিব, বঙ্গগণের ধারণা ছিল। বাস্তবিকও তাহাই। অন্নদা বাবুর জ্ঞান অমারিক লোক আমরা অতি অন্নই দেখিয়াছি। তাঁহার ভবনে যাইয়া দেখি, তিনি আমাদের অল্প আহারের দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন। অবাক হইলাম। তাঁহার অতুল যত্নে কিছু গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার

অকূল বন ও সেবার পরিচয় পাইয়া ঈশ্বরকে বারবার ধন্তবাদ দিলাম। রাজ্যে বন জাহাজ লক পার হইয়া খালে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল। আমরা তলপী লইয়া তাঁহার সহিত জাহাজে উঠিলাম। তাঁহার কামরায় আমরা স্থান পাইয়া পরম সুখে রাজি কাটাইলাম। সমস্ত রাজি জাহাজ চলিল। পরদিন প্রত্যুষে ভ্রূকের ঘাটে জাহাজ পৌছিল। অন্নদাপ্রসাদ বাবু প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভীরে নামিলেন, আমরাও নামিলাম। এই-বার তাঁহার সহিত শেষ বিদায়। তিনি আমাদের সুখের দিকে বারবার চাহিয়া দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে বলিলেন—“বা হউক, তবুও সাক্ষাৎ হইল।”

সমস্ত রাজি একত্রে কাটাইলাম, তখন সাক্ষাৎ হইল না, প্রাতঃকালে সাক্ষাৎ হইল, এ কিরূপ কথা? আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখন সাক্ষাৎ হইল, একথা বলেন কেন?” তিনি উত্তর করিলেন—“রাজির দর্শনে পরিচয় হয় না—মহা আঁধারে মাহুঘের আকৃতি বিকৃত হয়; বাতির আলো-কেও প্রকৃত আকৃতি কোটে না। রাজ্যে সাক্ষাৎ হয় নাই, এখন প্রকৃত সাক্ষাৎ হইল”—এই কথা বলিয়া তিনি আমাদেরকে অভিবাदन করিলেন, আমরাও করিলাম। তিনি হস্তমুখে বিদায় লইলেন, আমরা অপরিচিত স্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রথর বৃদ্ধি, অমায়িকতা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্য স্থলে চলিলাম।

ভ্রূকের সবডিভিসনাল অফিসার বাবু অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের নামে পত্র ছিল, আমরা তাহা লইয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলাম।



ভূত্বক ।

ভূত্বক বালেশ্বর জেলার একটা সব-ডিভিসন। সব-ডিভিসনে বাহা বাহা থাকে, এখানে সে সকলই আছে। ভূত্বক উপস্থিত হওয়ার পর, স্থানীয় অধিবাসীগণের বাহ্য বেশভূষা, আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের ধারণা অন্তরিত হইল, আমরা ক্রমে উৎকল পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গ-দেশাভিমুখে বাইতেছি। উৎকল কিরূপে বঙ্গ দেশের আচার পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইতেছে, ভূত্বক উপস্থিত হইলে সে শিক্ষা কতক হয়। ক্রমে ক্রমে উৎকল, বঙ্গ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বালেশ্বরে। ভূত্বক হই-তেই দেখা যায়, আর অধিবাসীরা চুল কামাইরা টিকী রাখে না, জ্রীলোকেরা তত গায়ে হলুদ দেয় না এবং বিকৃত কংস-বলয় ও কংস-বল ব্যবহার করে না—বজ্রাঘ্রিও কতক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ভাবার ও কথাই নাই—উৎকলের

অসহনীয় শাসনের বিরুদ্ধে লোকেরা উঠেছে, অসহনীয় শাসনের বিরুদ্ধে
 উঠেছে। বঙ্গভাষা কিরূপে উৎকল ভাষার রূপান্তরিত হইয়াছে, যেদিনী-
 পুর গেলে তাহা বুঝা যায়, আবার উৎকলের ভাষা কিরূপে বঙ্গভাষার পরি-
 ণত হইতেছে, ভদ্রক উপস্থিত হইলে অনুমান করা যায়। বালেশ্বর উপস্থিত
 হইলে, সন্দেহ নাই, এ বঙ্গপ্রদেশ না উড়িয়া? বঙ্গের যেদিনীপুর কতক
 উৎকলযে পরিণত, উৎকলের বালেশ্বর কতক বঙ্গযে পরিণত। উভয় হইনি
 দেখিলে ভাবিবার, শিখিবার, বুঝিবার অনেক উপকরণ পাওয়া যায়।

বলিয়াছি, ভদ্রক বালেশ্বরের একটি সব-ভিবিগন—পূর্বে লবণের জন্ত এই
 স্থান খুব বিখ্যাত ছিল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লবণের কারখানা এখন পরি-
 ত্যস্ত, ভগ্ন, পতিত। পতনের মহা আঁধার ভদ্রককে মলিন করিয়াছে। ব্যবসা-
 বাণিজ্য আর চলে না। গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহ আর কি!! এখন লিবরগুলের
 প্রতি গবর্ণমেন্টের সুদৃষ্টি, উৎকলের প্রধান ব্যবসা এখন লুপ্ত! ভাবিলে কোন
 পারাণ-হুম্বরের চক্কর জল না পড়ে? অত্যাচারের এমন জীবন্ত ছবি আর
 কল্পনা নাই। গবর্ণমেন্টের পক্ষপাতিত্বের এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত আর কোথাও
 নাই। ভিনিয়াছি, উৎকলে যে রূপ লবণ প্রস্তুত হইত, লিবরগুলের লবণ তদপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট নহে। বিনা অপরাধে দেশের একটি প্রধান ব্যবসা গবর্ণমেন্ট লুপ্ত
 করিয়াছেন। ইংরাজ-রাজের এক লক্ষ দুঃখপন্থের।

কেবল ইহাই নহে। গবর্ণমেন্ট দরিদ্রদিগকে লবণ প্রস্তুত করান জন্ত
 শুদ্ধতর শক্তি দিয়া থাকেন। বাড়ীর প্রাকণের একটু মাটি তুলিয়া জাল দিলেই
 লবণ প্রস্তুত হয়, মাহুকের প্রধান ব্যবহার্য্য জিনিস স্নগতে মিলে; গবর্ণমেন্টের
 তাহা সহ হয় না। হঠাৎ যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি ব্যবহারের জন্তও লবণ প্রস্তুত
 করে, তবে সে জন্তও তাহাকে কঠোর দণ্ড পাইতে হয়। এমন মাস নাই, যে
 মাসে এই জন্য শত শত নিরস্ত্র কৃষকের কারাবাস বা অর্থ দণ্ড সহ্য করিতে না
 হয়। আমরা যখন ভদ্রকে উপস্থিত হইরাছিলাম, তখনও এই অভিযোগে
 অভিযুক্ত ১০১২ জন লোক আনীত হইরাছিল। বিচারক দয়া করিয়া তাহা-
 দিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যে দেশে ডাঙুল সংগ্রহও দারুণ কষ্ট, সে দেশে
 লবণের জন্ত এরূপ গুরুদণ্ড আরপণনাই অব্যবহার্য্য কার্য্য। এ জন্ত পুলিশের
 যে কত অত্যাচার, বাহারা ভুক্তভোগী, তাহারাই জানে। ভদ্রক-রাজ্য আমা-
 দিগের দারুণ কষ্টের কারণ হইরাছিল। হুঃখের কথা শুনিতে ২ হুঃখের বিবরণ
 হইতেছিল। কত উচ্চ নিখাদ বে আকাশে বিলীন হইয়াছে, একবার সর্ব-

গাড়ী দেখতে ভিন্ন কেহই আসে না। এইরূপ অভ্যাচারের হস্ত হইতে গাড়ী গাড়ার জন্য উৎকলবাসীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাথের বেলায় গবর্ণমেন্ট অফ, উৎকলে এই ভেদ-নীতিরই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা গবর্ণমেন্টের একান্ত পক্ষপাতী, কিন্তু উৎকলের লবণের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট যে সে দেশের কি মহা অনিষ্ট করিয়াছেন, এক কণ্ঠে গাইতে পারি না। যদি গবর্ণমেন্টের কখনও পতন হয়, এইরূপ ভেদ-নীতিতেই হইবে।

ভদ্রকের কতিপয় শিক্ষক এবং ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ আলাপ করাই ভদ্রকের বিশেষ ঘটনা। দেখিবার আর বিশেষ কিছুই নাই। বাবু অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের সচ্ছন্দ্যতা ও বক্তৃতা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না।

আমরা রাত্রে আহালাস্তে গরুর গাড়ীতে বালেশ্বর বাতী করিলাম। বালেশ্বর ভদ্রক হইতে বহুদূর—৫০ মাইলের উপর পথ। মেদিনীপুর হইতে পুরী পর্যন্ত যে প্রশস্ত সন্দের রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা ভদ্রক এবং বালেশ্বরের মধ্যে। পথ সন্দের, ৭৮ মাইল অন্তরই চটি আছে; কিন্তু চটিতে প্রায়ই ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। এই সকল চটির স্থানে ২ তুপাকারে নর-অস্থি রহিয়াছে, দেখা যায়। পুরীর বাজীদিগের মধ্যে যখন মারিভর উপস্থিত হয়, তখন শৃগাল কুকুরের আহ্বারের জন্য যেন শত শত মৃত এবং অর্ধমৃত শরীর পরিত্যক্ত হয়! এমন নির্দয় ব্যবহার! অথবা এমন ধর্মান্ধরাগ! মারিভরের সময় আত্মীরেরা আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিদিকে ফেলিয়া পলায়ন করে, ইহা নির্দয়তার উজ্জল ছবি; কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সবেও কত সহস্র সহস্র বাজী পুরুষোত্তমে যাইয়া থাকেন। কি গভীর ধর্মান্ধরাগ! মানুষ্যের নির্দয়তা এবং মানুষ্যের গভীর ধর্মান্ধরাগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমরা বালেশ্বর-রাতিমুখে যাইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রিতে অতি অল্প পথ বাওয়া হইল। পরদিন প্রাতে কতক দূর যাইতে যাইতেই প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে গাড়োরান ও গরু কাতর হইয়া পড়িল। স্তবরাং আমরা এক চটিতে মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাপন করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বন্ধু বড় চতুর, তিনি যৎসুত কেনার ছল ধরিয়া পলায়ন করিলেন। আমাকেই রন্ধনের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল।

বালেশ্বর।

অপর্য্যাপ্ত আমাদের গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। পরদিন ৯টার সময় আমরা বালেশ্বর পৌছিলাম। বালেশ্বর আধুনিক সহর নয়। এখানে বালেশ্বর

মিচিলিয়ান্স বর্গগ্রাফ, ওলন্দাজ (Dutch)-দিগের খনিজ খাল, কবর এবং কুমীর
কবরাদেশ আছে। ওলন্দাজ-কবরের একটার উপরে ২৮শে নবেম্বর, ১৬৯৬
খ্রিঃ (Michillians Burggraaf Vanseven Huisenobut.) লেখা আছে।
বিতীরটাতে Inbella 8y VLIA. লেখা আছে।

বালেশ্বরের পূর্ব এবং উত্তরে একটি ছোট নদী আছে, তাঁটার সময়
এই নদীর স্থানে স্থানে হাটিয়া পার হওয়া যায়। এই নদীটা অন্তান্ত নদীর
দ্বিতীয় মিলিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। বালেশ্বর সহরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার্য আফিসাদি বাদে, এখানে বিশেষ পরিচয়ের জিনিস
বালেশ্বর-ব্রাহ্মমন্দির, রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের রাজবাটা এবং দাস-
পরিবারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এতদ্বিতীয় খ্রীষ্টীয় মিসনরীদিগের কীর্তি-
কলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে দাস-পরিবারের শুলুক জাহাজ সমুদ্রে
দিয়া নানাদেশে বাণিজ্য করিতে বাহিত। আমরা যখন বালেশ্বরে উপস্থিত
হইয়াছিলাম, তখন অনেকগুলি ভগ্ন শুলুক জাহাজ এই ক্ষুদ্র নদীতে দেখিয়া-
ছিলাম। এখন ষ্টিমার প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-পরি-
বারের ব্যবসা হীনদশায় উপস্থিত হইয়াছে।

বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের কীর্তির সমতুল্য কীর্তি আমরা আর কোথাও দেখি
নাই। বাবু ভগবানচন্দ্র দাস, বাবু গঙ্গালোচন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণের জীবন্ত
দৃষ্টান্তে বালেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুন্দর ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। এখান-
কার ব্রাহ্মপন্থী বিশেষ দ্রষ্টব্য। অনেক শ্রমজীবীর পরিবার এই পন্থীতে বাস
করেন। এরূপ সুন্দর দৃষ্ট আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বালেশ্বর
জেলাতে ব্রাহ্মধর্ম যে রূপ আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ
বুঝি বা আর কোথাও হয় নাই।

খ্রীষ্ট রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর দেশের উন্নতির জন্ত বিশেষ যত্নবান।
উৎকল ভাষার সংবাদ পত্র প্রচারের জন্ত অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন, স্কুলের
জন্ত যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন, নানা সংকাজে প্রচুর অর্থ দিতেছেন; এমন কি,
ব্রাহ্মসমাজেও সময়ে ২ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত আমরা এক-
দিন সাক্ষাৎ করিতে বাইয়া, তাঁহার সৌজন্তে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম।
রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিনি গরীব দুঃখীর কথা বিস্তৃত হন না, তাঁহার মহত্ব
অতুলনীয়। রাজা বৈকুণ্ঠনাথ বালেশ্বরের মধ্যে বিশেষ গৌরবের জিনিস।

বৈকুণ্ঠনাথের রাজত্বকাল একদিকে, অন্যদিকে বাবু গঙ্গালোচন দাসের

উৎকল-ভ্রমণ ।

প্রথম : উত্তরই আমাদের নিকট বিশেষরূপ আদৃত । ধর্মীর ভবন এক দরিদ্রের গর্ভকুটার—উত্তরকে সম-আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম কেন ? কারণ এই—দয়া দাক্ষিণ্যে রাজভবন এবং পবিত্রতা ও বোগ ধ্যানের সমবেশে এই দরিদ্র-আশ্রম বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত । নদীর অপর তীরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত । আশ্রম দেখিয়া আমরা বারগরনাই পুলকিত হইয়াছিলাম ।

বালেখরের জীবনী শক্তি বাবু ভগবানচন্দ্র দাস । ইহারই চেষ্টায় বালেখরের পল্লীতে ২ ব্রহ্ম নামের বিজয় নিশান উড়িতেছে । হৃৎথের বিষয়, আমরা বখন বালেখর গিয়াছিলাম, ভগবান বাবু তখন ছিলেন না । এই হৃৎথ বড়ই প্রাণে বাজিয়াছিল । বালেখরের সজ্জন বন্ধুবর্গের দয়ার আমাদিগকে আহারাদির কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই । কিন্তু বালেখরে জাহাজ ধরিতে আমাদিগকে তিন দিন বারগরনাই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । প্রত্যহ দিবসের এবং রাত্রের আহারান্তে আমরা জাহাজ-ঘাটে অপেক্ষা করিতাম । কিন্তু কোথায় জাহাজ ? তিন দিন তিন রাত্রি আমাদিগকে জাহাজের অপেক্ষার ঘাটে কাটাইতে হইয়াছিল, সে যে কি কষ্ট, ভাষায় ব্যাখ্যা হয় না । বসিয়া বসিয়া সারাদিন সারারাত্রি কাটাইতে হইত । সে কষ্ট ব্যাখ্যা করা দুকর । ইহার মধ্যে একদিন জাহাজ-ঘাটের নিকটে উৎকলের বাজা শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম । বাজার বিষয় এই, গানের সময় গান, বাজনার সময় বাজনা ; বাজলার ছায় গান বাজনা এক সঙ্গে হয় না ; আর সেই কর্ণ-বধিরকারী প্রকাণ্ড করতালের ঝনঝনানি । ভাল বলি আর মন্দ বলি, এই দিনই যা কিছু সুখ পাইয়াছি, আর সব দিন কর্কশ, নীরস, শুষ্ক ভাবে জাহাজ-ঘাটার সময় কাটাইতে হইয়াছিল । বালেখরে কি জীবন নাই ? একরূপ জাহাজের অনিয়ম কি তাহার চেষ্টা করিলে দূর করিতে পারেন না ? মানুষ কষ্ট সহিয়া সহিয়া শেষে নিশ্চেষ্ট, নিরেট, হত-চিত্ত হইয়া যায় ; বুঝি বা বার মাস, এই জন্তই, বালেখরবাসীরা জাহাজ-বাটার কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন । বাউক, সে কথার কাজ কি ?

চতুর্থ দিনে আমরা জাহাজ পাইলাম । নলকূলে যাইয়া নূতন জাহাজ ধরিতে হইল । এইবারে তীরবর্তী-খাল (Coast canal) দিয়া আমরা মহিবা-দল হইয়া গঙ্গাখালিতে যাইব । এখানেও পূর্বাশ্রুত,খালের মধ্যে মধ্যে নদী । নদীতে বখন ভাটা থাকে, তখন খালে জাহাজ অপেক্ষা করে । বাধ দ্বারা খালের জল ঠিক রাখা হইরাছে বটে, কিন্তু সুবর্ণ-রেখা নদী প্রকৃতিতে বাধ নাই ; সুতরাং সময় সময় জোয়ারের জল অপেক্ষা করিতে হইল ।

আহাজে মহা দোকের হই তিন দিন অবধি, এবং এক সময়
 কলিকাতা, ব্যতীত অন্যত্র। কষ্ট না সহিলে অভিজ্ঞতা হয় না, তাহারা
 প্রলম্বচিত্তে এই দাক্ষণ কষ্টও সহিয়াছিলাম। খালের দৃষ্ট মনোরম—সোজা খাল,
 মধ্যে মধ্যে চটী আছে। চটীতে জাহাজ থামিলে মল মূত্র ত্যাগ ও আহাৱাদি
 দ্রব্যাণন করিতে হয়। রাত্রে হিম, দিবসের উষ্ণতা—মাহুবকে একবার জলখবরে,
 আবার শুক করে; জাহাজে কাজেই অনেক পীড়া হইয়া থাকে। শেষ দিন এক
 মুসলমান তত্ত্ব মহিলাকে ওলাউঠায় আক্রমণ করিয়াছিল। আমরা যথাসাধ্য
 তক্ষণ করিয়াছিলাম; কিন্তু শেষে গেরখালিতে তাহাকে রাখিয়া আসিতে
 হইয়াছিল। আর একদিন কষ্ট সহিলে আমরাও পীড়িত হইতাম, একজ্ঞ
 জাহাজ ঐ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া হীরক-বন্দর (Diamond Harbour)
 হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। উৎকল-ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল।

উপসংহার।

ইচ্ছা করিয়াই আমরা সামাজিক বিষয়ে এবং উৎকলের ভাবা সম্বন্ধে
 বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই। উৎকলে বৈদ্য জাতি নাই; ব্রাহ্মণ, করণ,
 খণ্ডায়েং, মহাস্তি প্রভৃতি জাতিই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। করণ জাতি
 বাকালার কারস্থ জাতির অনুরূপ। খণ্ডায়েং ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-
 বিবাহ প্রচলিত আছে। গোলাম হইতে খণ্ডায়েং এবং খণ্ডায়েং হইতে কর-
 ণের উৎপত্তি। খণ্ডায়েং, মহাস্তি এবং করণদিগের বয়স্হা মেয়েদিগের বিবাহ
 হয়। বিধবার পূর্ক বিবাহের পূত্র কস্তা, দ্বিতীয় বিবাহের স্বামীকে খুড়া বলিয়া
 ডাকে। খণ্ডায়েংদিগের ত্রীলোকেরা পুঁথি লেখে এবং পড়ে।

আমরা ডিরেক্টর সাহেবের রিপোর্টে দেখিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা ও
 ত্রী-শিক্ষার উৎকল বঙ্গপ্রদেশকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তাল পাতার
 পুঁথি পড়িতে প্রায় সকলেই পারে। উৎকল-ভ্রমণ করিয়া আমাদের এই
 ধারণা হইয়াছে, সব বিষয়ে না হউক, অনেক বিষয়ে উৎকল বঙ্গপ্রদেশ
 অগেছা উন্নত। বঙ্গদিগের সাহায্যে উৎকলের ভাবা-সংস্কারকদিগের নাম
 ও বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তক সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা
 প্রকাশ করিতে কষ্ট রহিল। কারণ এই, আসাম ও উৎকলের দেবমন্দির
 সমূহে বেরুগ সাহুজ দেখিয়াছি, তাহাতেও সেইরূপ সাহুজ আছে; আসাম
 ও উৎকলের ভাবা-বক্তব্য হইতে পৃথক-রাখা জাতীয় একজনের পক্ষে বিশেষ

ভাষা-কথন-রূপ-মূলক, এই ভিন্ন ভাবনা।

স্বায়ং, গণনা-মোটের (Divide and rule policy) বিভাগ-কল্পিত। শাসন-নীতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের জাতীয়তা গঠনের ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। উৎকল-হিঁতৈবী ব্যক্তি একথা-চিন্তা করেন, একান্ত বাসনা। এ কথা ভারতের অংশ-খা জাতির ক স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাদ্দালী, প্রতিভা এবং কৃষ্ণ-মুখী শারীর বল, মনোবল, বুদ্ধিবল ও প্রতিভাবল চরিত্রের ভিত্তিকে জটিল করিতে সমর্থ হইলে, তবে জাতির উত্থান হয়। বাদ্দালীকে বাদ দিয়া ভারতের কোন সংস্কার হইতে পারে না। উৎকল এবং আসামবাসী জাতগণ এ কথাটা বিশেষরূপ অমুখাবন করিলে, দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে। আসাম, বঙ্গ ও উড়িষ্যা—এক রাজ্যের তিন শাখা, এক দেহের তিন অঙ্গ, এক জাতির তিন প্রাণ। তিনের ভাষা এক, এবং একের ভাষা তিন হইলে, এক অপূর্ণ নববলের সৃজন হইবে। কিন্তু ভেদ-নীতির বিঘ্নতির দিনে তাহাও কি হইবে ?

উৎকলে অনেক সম্রাট বাদ্দালী বাড়ী ঘর নির্মাণ করিয়া বংশাধিকারে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে উৎকলে কেরা-বাদ্দালী বলে। তাঁহাদিগের ভাষা, ভাঙ্গা বাদ্দালা। ভাষা-কথনের দোষেই তাঁহাদিগকে কেরা-বাদ্দালী বলে।* এই বাদ্দালীদিগের সংখ্যা অনেক। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার অনেকটা বাদ্দালীদিগের মত। কাল সহকারে ক্রিয়া কর্মাদি ওদেখেই করিতে হইতেছে। দিন দিন তাঁহাদের সমাজ খুব বিঘ্নিত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা, উৎকলের হাবভাবে অনেকটা অমুপ্রাণিত হইলেও, পিতৃপুরুষের আচার, ব্যবহার ও ভাষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কতক উৎকলকে পরিণত হইয়াছেন এবং উৎকলকে কতক বদলে রূপান্তরিত করিতেছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা জাতীয় একতার একটা সুমহান কার্য, অলঙ্কিতভাবে, সাধিত হইতেছে। জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় জাতি-ভেদ। কেবল জাতিভেদ নয়, দেশভেদে সমাজ-ভেদও বটে। বাদ্দালীরা এক কার্য সমাজের বিভিন্ন শাখার আদান প্রদান চলে না, এমন কি, আহাঙ্গাদিও চলে না। ব্রাহ্মণদিগের ত নির্দিষ্ট ঘর ভিন্ন হুল রাখিয়া বিবাহ হই হইতে পারে না। বাদ্দালীর কার্যদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের মীমা শাখার বধন বিবাহাদি চলে না, তখন ভারতের অন্যান্য দেশের কার্য ও ব্রাহ্মণদিগের

উৎকলবাসী, এ ভারতের মঙ্গল নাই। আন্তর্জাতিক শিবার প্রথা
 এই ভারতে প্রচলিত হইবে? আশা কম। তবে উৎকলবাসী
 তারা যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, জন্মে এমন
 কতক গুণাবিত হইলেও হইতে পারে। জাতি-বিবেচ প্রত্যেক
 মানুষের হইতে উদ্ভূত না হইলে, এ ভারতের কখনও মঙ্গল
 উৎকলবাসী বাঙ্গালীদিগের উপর আমাদিগের অনেক
 অনিশ্চয় বান্ধালীদিগের প্রতি আসামীরদিগের ভাল ভাব নাই।
 কালে বাঙ্গালীদিগের দৃষ্টিভঙ্গির দরুণই, শুনিয়াছি, এরূপ হইয়াছে।
 বিবেচনা আমাদের অহিমজ্ঞা গ্রাস করিয়াছে। সেখানে বাঙ্গালীরা সাধু
 আসামীর বন্ধুদিগকে অস্ব করিতে না পারিলে, সেখানে জাতীয়
 কোন আশা নাই। কিন্তু উৎকল সম্বন্ধে আমরা সেরূপ আশা-শূন্য নই।
 বাঙ্গালীরা উৎকলে সম্মান, প্রতিপত্তি ও সম্পদহীন নহেন।
 জন্মে জন্মে উৎকলবাসীদিগকে যদি বাঙ্গালা ভাষার দীক্ষিত করিতে
 ভারতের এক অলৌকিক কার্য সাধিত হইবে। আসামীর বন্ধুগণ
 বাঙ্গালীরা-বিবেচী, উৎকলবাসীরা সেরূপ নহেন। বাঙ্গালা ভাষা
 উৎকলে পৃথক অধিকার করিতে পারে, এক বৈষ্ণব-মুন্সী উৎকল
 ও বাঙ্গালীতে একতা অসম্ভব হইবে কেন? বিধাতা উৎকল-বাসী
 লীকে একতা-যুগে আবদ্ধ করুন।

উৎকল যশে বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা উন্নত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়া
 বৈষ্ণব-মুন্সী যশে অনেকটা বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু উৎকলে প্রভূত পবিত্র
 করিতে সক্ষম হইয়াছে। সহরের বা উপসহরের দৃষ্টিভঙ্গি-মুটে মজুর
 রেল পবিত্র ও সরল বঙ্গ-কৃষকের অবস্থা জানা যায় না, কলিকাতা
 হান্নের উৎকলবাসীদিগকে দেখিয়াও, সেইরূপ, উৎকলের প্রকৃত চরিত্র
 যায় না। সহরে বাহারা থাকে, তাহারা উচ্ছ্রাল এবং সমাজ-বন্ধনের
 হয়। দেশের দেশের লোকচরিত্র বিচার করিতে হইলে, পল্লীগামে যা
 উৎকলের পল্লীগাম বঙ্গ-পল্লীগাম হইতে উন্নত, আমাদের বিশ্বাস। আশা
 দিনের দৃষ্টিভঙ্গির অপেক্ষা করিতেছি, যে দিন বঙ্গবাসী ও উৎকলবাসী
 পূর্ণ জাত্যগ্রেমে আবদ্ধ হইয়া, জাতীয় একতার পবিত্র দৃষ্ট দেখাইয়া অগ
 ঘোষিত করিবে। বিধাতা সেই দিন আনয়ন করুন।

সম্পূর্ণ।



এইটেল এবং শেষ দুই কথা—১/১ বা শতক বোঝাই লেনে প্রিটবেশ চলে যান কলকাতা
 পণ্ডিত-বহুরী-গেমে প্রসিদ্ধ। অধ্যাপক-অবনী-গেমে প্রসিদ্ধ।

